মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের জীবন ও সমকাল

নাট্যকারের জীবন দর্শন, চরিত্র-চিত্রণ, সমাজ ভাবনা, বিষয় নির্বাচন সবকিছুই উঠে আসে সমসাময়িক আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট থেকে। উত্তর আধুনিক বাংলা নাটকের ইতিহাসে বিজন ভট্টাচার্য, উৎপল দত্ত, বাদল সরকার, মনোজ মিত্রের সমসাময়িক আরও একজন খ্যাতিমান নাটককার হলেন মোহিত চট্টোপাধ্যায়। যিনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর বাংলা নাটকে স্বাতন্ত্র্য এনে দিয়েছেন। তাঁর নাটকের বিশিষ্টতার জন্য বহু সমালোচক বহু বিশেষণে বিশেষিত করেছেন তাঁকে। অনেকে তাঁর নাটক সম্পর্কে দুর্বোধ্য ও জটিলতার অভিযোগও করেছেন। তিনি যে সময়ে বড়ো হয়েছেন সে সময়টা ছিল যুদ্ধ-বিধ্বস্ত এক ক্রান্তিকাল, সংকটের সময়। স্বাভাবিক ভাবে তাঁর রচনায় আশৈশব লব্ধ জীবন অভিজ্ঞতা শিল্পের উপাদান হিসেবে গুরুত্ব লাভ করে। ব্যক্তি জীবন প্রতিফলিত হয় সাহিত্যে। সুতরাং নাটককারের আশৈশব লালিত ব্যক্তি জীবনের পরিচয় তাঁর নাট্যদর্শনকে স্পষ্ট করে তুলতে সাহায্য করে। নাটককার মোহিত চট্টোপাধ্যায় নাটকের বাস্তবতা সম্পর্কে বলেছেন একটা চরিত্র অতীত এবং বর্তমান নিয়ে সম্পূর্ণ নয়, বর্তমানের সঙ্গে সঙ্গে অতীত এবং ভবিষ্যৎও প্রাসঙ্গিক ভাবে জড়িত। মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের ব্যক্তি জীবনের আলোচনায় তাঁর সমসাময়িক সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট স্বাভাবিকভাবেই উঠে আসে। "মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের নাটক জীবন ও শিল্প" বিষয়ক আলোচনার সুবিধার জন্য তাঁর জীবন ও সমকালের সংক্ষিপ্ত রূপরেখা এই অধ্যায়ে আলোচনার প্রয়াস রইল।

স্বাধীনতা-উত্তর বিশ শতকের ষাটের দশক থেকে একুশ শতকের দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত সময় কালের ইতিহাস সৃষ্টিকারী নাটককার মোহিত চট্টোপাধ্যায় ১লা জুন ১৯৩৪ (পারিবারিক সূত্রে প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে ১৯৩৬, অফিশিয়ালি ১৯৩৪)[১] পূর্ববঙ্গ বর্তমানে বাংলাদেশের বরিশালে নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ও রেণুকাদেবীর দ্বিতীয় সন্তান (প্রথম কন্যা সন্তান মায়া দেবী) রূপে জন্ম গ্রহণ করেন। মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের ঠাকুরদা যামিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

পূর্ববঙ্গের ফরিদপুরের উকিল ছিলেন। পিতৃদেব নগেন্দ্রনাথের (১৯০৭-৯১) আদি নিবাস ছিল পূর্ববঙ্গ বরিশাল জেলার ফকিরবাড়ি রোড। তিনি বরিশাল শহরের সাধারণ উকিল ছিলেন। প্রথমে ওকালতি করতেন। ১৯৪৭ সালে ভারতের স্বাধীনতা লাভের প্রায় মাস দু'য়েক আগে ওকালতি ছেড়ে তিনি সপরিবারে কলকাতায় আসেন। এই প্রসঙ্গে জানা যায় –

> "... দেশবিভাগের বিপর্যয়ে পশ্চিমবাংলায় এসে উত্তর কলকাতার বৃন্দাবন বসাক স্ট্রিট-এর একটি জীর্ণ অট্টালিকার এক অংশে ভাড়া নিয়ে বসবাস করেন তাঁরা। আনন্দ বাগচীর ভাষায়- 'ভাঙাচোরা বারোয়ারি দুর্গের মতো বাড়ি'। শিবশম্ভু পালের ভাষায় 'একটি প্রাক্-পুরাণিক বাড়ি'। আরও একটু অনুপুঙ্খ বিবরণ মতি নন্দীর লেখাটিতে- "ওরিয়েন্টাল সেমিনারির গা দিয়ে বৃন্দাবন বসাক স্ট্রিট। একটু ঢুকেই ডানদিকে মাটির গলি। সেটা সোজা গিয়ে ডানদিক বাঁদিক বেঁকেছে একটা বাড়ির তলা দিয়ে। মনে হত যেন সুড়ঙ্গ দিয়ে যাচ্ছি। একটা খোলা বড় উঠোনে গলিটা শেষ হয়েছে। কাপড় কাচা, বাসন মাজা, স্নান করা চলত উঠোনে। উঠোন ঘিরে ভাড়াটিয়া। তিন তলায় থাকত মোহিতরা। প্রাচীন জরাজীর্ণ এমন বাড়ি উত্তর কলকাতাতেও বোধ হয় দ্রষ্টব্য হওয়ার মত।"[২]

কলকাতায় আসার পর নাটককারের পিতা খাদ্য বিভাগে অফিসার রূপে জীবিকা নির্বাহ করেন। মাতৃদেবী রেণুকা চট্টোপাধ্যায় (মুখোপাধ্যায়) এন্ট্রান্স পাশ। সাহিত্যের নিবিড় পাঠক ছিলেন। তিনি ছিলেন স্বভাব কবি। মনের আনন্দে গান ও কবিতা লিখতেন তিনি। কোথাও ছাপানো তিনি পছন্দ করতেন না। তিনি অন্তরালে থাকতে বেশি পছন্দ করতেন। গান কিংবা কবিতা লেখার পর তিনি তাঁর ছেলে মেয়েদের পড়ে শোনাতেন। নাটককারেরা মুগ্ধ হয়ে তাঁর কবিতা, গান শুনতেন। কবিতার পাশাপাশি মায়ের সহজাত কবিত্ব শৈশবেই প্রভাবিত করেছিল নাটকারকে। মাতৃসূত্রে মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের সাহিত্যের প্রতি আকর্ষণ তৈরি হয়।

রেণুকাদেবীর পিতৃদেব মনোরঞ্জন মুখোপাধ্যায় ও মা (মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের দিদিমা) হিরণমালা দেবী ছিলেন নাটককারের প্রাণের মানুষ। এঁরা থাকতেন বরিশাল শহর থেকে দূরে নগরপাড়া গ্রামে। বাল্যকালে মামার বাড়িতে সব থেকে সুখের দিন কেটেছে তাঁর। লেখালেখির ক্ষেত্রে পারিবারিক প্রভাব প্রসঙ্গে তিনি এক সাক্ষাৎকারে শৈশব স্মৃতিচারণ করে বলেছেন –

> "সহজাত কবিত্ব নিয়ে মা কবিতা লিখতেন। সে কবিতাগুলি আমাকে খুব ভাবিয়েছে। আমার এক দাদু ছিলেন। তাঁর একটি গভীর শিল্পী মন ছিল। তিনি চিলেকোঠায় বসে এক মনে দু'তিন ঘন্টা সেতার বাজাতেন। কোনও আসরে বাজাতেন না, কাউকে শোনাতেন না। আমরা নিচে বসে তাঁর সেতার শুনে বিমোহিত হয়ে যেতাম। অন্তরের তাগিদে মায়ের কবিতা, গান লেখা এবং দাদুর তন্ময় হয়ে সেতার বাজানো আমাকে ভীষণভাবে অনুপ্রাণিত করেছে। মা ও দাদুর প্রভাব গভীরভাবে আমার মধ্যে পড়েছে। আমার জিনের মধ্যে সৃষ্টিশীল মনের প্রভাব হয়ত আছে। তারপর কলকাতায় থাকার সময় লেখার ইচ্ছে জেগে ওঠে। কবিতা, গল্প, উপন্যাস লেখার বাসনা হয়।"[৩]

নাটককারেরা ছয় ভাইবোন– মায়া চট্টোপাধ্যায় ছিলেন নগেন্দ্রনাথ রেণুকাদেবীর প্রথম কন্যা সন্তান। তিনি ছিলেন নাটককার মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের বড়দিদি, বাঘাযতীন অঞ্চলে বসবাস করেন, সঙ্গীতচর্চা করতেন। মোহিত চট্টোপাধ্যায় ছিলেন তাঁর বাবা মায়ের দ্বিতীয় সন্তান এবং প্রথম পুত্র সন্তান। মলয় চট্টোপাধ্যায় নাটককারের ভাই। বাড়ির সকলের কাছে তিনি নান্টু ডাকনামে পরিচিত ছিলেন। আশুতোষ কলেজে ভূগোল বিষয়ে বিভাগীয় প্রধানরূপে অধ্যাপনা থেকে অবসর গ্রহণ করেন। তিনি বিবাহ করেননি। মণি চট্টোপাধ্যায়, নাটককারে বোন। এক সময় তিনি চিত্রকলা বিষয়ে চর্চা করতেন। ইনিও বিবাহ করেননি। রেবা চট্টোপাধ্যায়

নাটককারের ছোট বোন। নৃত্যশিল্পী হিসেবে বিশেষ খ্যাত। ইনি রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃত্যবিভাগ থেকে প্রথম বিভাগে প্রথম স্থানাধিকারী হিসেবে সিনিয়র ডিপ্লোমা ডিগ্রি লাভ করেন। এছাড়া সর্বভারতীয় মণিপুরী নৃত্যে প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান লাভ করেন প্রাচীন কলাকেন্দ্র থেকে। ইনি যুক্ত ছিলেন ললিতকলা আকাদেমি এবং দক্ষিণী, সুরধ্বনি, স্বর্ণময়ী মিউজিক কলেজের সঙ্গে। 'নৃত্যাঙ্গন' নৃত্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের কর্ণধারপদে আসীন আছেন বর্তমানে। নাটককারে ছোট ভাই সুকল্প চট্টোপাধ্যায় পিতামাতার কনিষ্ঠ সন্তান। তাঁর ডাকনাম ছিল নিন্টু। ইনিও অবিবাহিত। একসময় কবিতা চর্চায় আগ্রহ ছিল যথেষ্ট। বর্তমানে অসুস্থ আছেন।[৪]

বালক মোহিতের শিক্ষাজীবন শুরু হয় মামা বাড়ি নগরপাড়ার পাঠশালায়। সেখানে তিনি প্রথম শ্রেণিতে পাঠরত ছিলেন। পরে সেখান থেকে তিনি জন্মস্থান বরিশালে চলে আসেন। ১৯৪০ সালে বরিশালের নামকরা সব থেকে বড় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ব্রজমোহন বিদ্যালয়ে তৃতীয় শ্রেণিতে ভর্তি করে দেওয়া হয় তাঁর মেধার কারণে। এ প্রসঙ্গে প্রাসঙ্গিক একটি উদ্ধৃতি উল্লেখ্য -

> "লাজুক কৃষ্ণবর্ণ এবং শীর্ণকায় ছেলেটির বন্ধুমহলে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করে তার মেধা এবং বুদ্ধিমত্তার কারণে। গল্প ও কথা বলাতেও তার জুড়ি ছিল না। শিক্ষক মহলেও যথেষ্ট আদর ছিল। শরীরে শক্তি না থাকলেও মনের সাহস ছিল অপরিসীম।"[৫]

তৃতীয় শ্রেণিতে ভর্তির ফলে দ্বিতীয় শ্রেণির পাঠ গ্রহণ তাঁর জীবনে ছিল না। এই বিদ্যালয়ে তিনি সপ্তম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করেন। বলাবাহুল্য রবীন্দ্রোত্তর কবি জীবনানন্দ দাশ এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী ছিলেন। এছাড়া এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার পাশাপাশি খেলাধুলাও চলত একই ছন্দে। অন্যান্য শিক্ষার্থীর ন্যায় বালক মোহিতেরও নিত্যদিনের আনন্দের বিষয় ছিল স্কুল ছুটির পর ক্রিকেট, ফুটবল খেলা এবং বিদ্যালয়ের খেলার মাঠ

সংলগ্ন পুকুরে সাঁতার কাটা। বিদ্যালয় জীবন থেকেই খেলাধুলার প্রতি তাঁর প্রবল ভালোবাসা জন্মায়। ক্রিকেট, ফুটবল দুটোই তাঁর খুব প্রিয় খেলা ছিল। বাঙালি ক্রিকেটার সৌরভ গাঙ্গুলি তাঁর প্রিয় খেলোয়াড়। তাকে তিনি আদর করে বলতেন 'আমার গোপাল'। জন্মস্থান পূর্ববাংলা হওয়ার কারণে ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবের প্রতি টান ছিল অদম্য। তাই তিনি খেলার মাঠে নিজেকে 'ইষ্টবেঙ্গলি' বলে অভিহিত করতেন। তিনি আজীবন বামপন্থী মতাদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন। আর্তুর র‍্যাঁবো মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের অত্যন্ত প্রিয় কবি ছিলেন।

১৯৪৬ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা কারণে অগণিত মানুষ বাংলাদেশ ছেড়ে ভারতে বিশেষ করে পশ্চিমবাংলায় এসে আশ্রয় নেয়। এই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পাশাপাশি দেশ জুড়ে স্বাধীনতা লাভের কোলাহলমুখর এক উত্তাল সময়। দাঙ্গা, দেশভাগ প্রভৃতি যন্ত্রণাদায়ক পরিস্থিতিতে ব্রজমোহন বিদ্যালয়ে সপ্তম শ্রেণির পাঠ ছেড়ে বালক মোহিত মাত্র ১৩ (মতান্তরে ১১) বছর বয়সে পরিবারের সঙ্গে কলকাতায় চলে আসেন ১৯৪৭ সালের জুন মাসে। পরবর্তীকালে ১৫ই আগস্ট ভারত স্বাধীনতা লাভ করে। কলকাতার চিৎপুর বয়েজ স্কুলে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়ে নবম শ্রেণিতে ভর্তি হন। ফলে তাঁর ছাত্র জীবনে অষ্টম শ্রেণির পাঠ লাভ করা হয়নি। তিনি অল্প বয়সে লিখতে শুরু করেন। কলকাতায়, তিনি বিডন স্ট্রিটে তাঁর বাড়ির কাছাকাছি চৈতন্য গ্রন্থাগারের নিয়মিত পাঠক ছিলেন। লাইব্রেরীতে তিনি পিরানদেল্লোর 'সিক্স ক্যারেক্টার সার্চ অ্যান অথার' বইটি পাঠ করে হতাশ হয়ে পড়েছিলেন, একটি অযৌক্তিক খেলার সাথে তার প্রথম পরিচিতি। তিনি ১৯৫০ সালে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় পাশ করেন। ১৯৫২ সাল উত্তর কলকাতা সিটি কলেজে বাংলায় অনার্স নিয়ে বি.এ. পড়েন তিনি। তখন তাঁর সহপাঠী ছিলেন একদল তরুণ প্রতিভাবান। তিনি সহপাঠী হিসেবে পেয়েছিলেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, ফণীভূষণ আচার্য, শিবশম্ভু পাল। ১৯৫২ সালে তিনি কবিতা লেখা শুরু করেন। অবশ্য তার আগে কৈশোরকালে অর্থাৎ নবম-দশম শ্রেণিতে পড়ার সময় 'তোমার পতাকা যারে দাও' নামে তিনি একটি উপন্যাস লিখেছিলেন। তাঁর দূর সম্পর্কের এক দাদার উদ্যোগে প্রকাশিত 'মন্দির' নামক পত্রিকায় 'মধ্যবিত্ত' নামে প্রথম গদ্যকবিতা

ছাপা হয়। ১৯৫৩ সালে 'কৃত্তিবাস' পত্রিকায় সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের পাশাপাশি একজন প্রধান সারির কবি হয়ে ওঠেন মোহিত চট্টোপাধ্যায়। যাঁদের হাতে পঞ্চাশের দশকে বাংলা কবিতা প্রাক্-স্বাধীনতা পর্বের কবিতা স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য নিয়ে উপস্থাপিত হয়। কবিতার প্রতি তাঁর আন্তরিক টান ছিল। কলকাতার বড়ো বড়ো সাহিত্য পত্রিকায় একই সঙ্গে তাঁর তিনটি কবিতা প্রকাশিত হওয়ার তিনি করেছিলেন সারা জীবন শুধু কবিতা ছাড়া অন্য কিছু লিখবেন না। ১৯৫৪ সালের শম্ভু মিত্র নির্দেশিত ও অভিনীত রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী' নাটকের প্রথম নাট্যাভিনয় দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যান। ১৯৫৫ সালের ২৬ আগস্ট বসু- বীণা-শ্রী সিনেমায় সত্যজিৎ রায় পরিচালিত 'পথের পাঁচালী' চিত্রাভিনয় দেখে মুগ্ধ ও উদ্দীপিত হন। ১৯৫৬ সালের ভাদ্র মাসে (১৩৬৭ বঙ্গাব্দ) মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'আষাঢ়ে শ্রাবণে' বুক রিভ্যু প্রকাশনা থেকে প্রকাশিত হয়। প্রকাশ করেন পবিত্র মুখোপাধ্যায়। কাব্যগ্রন্থটি বাবাকে উৎসর্গ করেন কবি মোহিত। বিশেষ সহায়তার হাত বাড়িয়ে দেন বন্ধু বীরেন্দ্র দত্ত। প্রথম গ্রন্থ মুদ্রণকালে ১৯৫৬ সালে নাট্য নির্দেশক শ্যামল ঘোষের সঙ্গে কবি (পরে নাটককার) মোহিতের পরিচয় হয়। সিটি কলেজের পাঠ শেষ করে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা লিটিল ম্যাগাজিন-এ বছরে ৫০ থেকে ৫২ টা কবিতা লেখার পাশাপাশি সংসারের হাল ধরতে ডালহৌসিতে গিয়ে ইনকাম ট্যাক্স অফিসে চাকরি গ্রহণ করেন ১৯৫৪ সালে। একই সঙ্গে তিনি প্রাইভেটে এম. এ. পরীক্ষার প্রস্তুতি নেন। ১৯৫৮ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রাইভেটে এম. এ পাশ করেন। ১৯৫৯ সালে অধ্যাপনার কাজ নিয়ে কলকাতা ও প্রিয় বন্ধুদের ছেড়ে সুদূর মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গিপুর কলেজে চলে যান। জঙ্গিপুর কলেজে অধ্যাপনা কালেই তাঁর মধ্যে নাটক রচনার বীজ অঙ্কুরিত হয়ে ওঠে। এই প্রসঙ্গে বন্ধুপ্রতিম বীরেন্দ্র দত্ত জানিয়েছেন-

> "জঙ্গীপুর কলেজে অধ্যাপনার চাকরি নিয়ে ১৯৫৯-এ চলে যাওয়ার পর একটানা সাত বছর তিনি ছাত্রছাত্রীদের অভিনয়ে প্রধান উৎসাহদাতা হয়ে উঠেন। তাঁর মতে: 'ধীরে ধীরে কুঁড়ি থেকে ফুল হয়ে ওঠার মত কখন যেন

কবি মোহিতের কবিতার 'ইমেজ' কল্পনা নাটকের আঙ্গিকে ভিন্ন প্রতীকের মাত্রা ও ব্যাখ্যা পেতে থাকে।"[৬]

এখানে অবশ্য বলা বাহুল্য, নাটককার মোহিত এক সাক্ষাৎকারে নাটকের প্রতি তাঁর অন্তরের টান প্রসঙ্গে জানিয়েছেন-

"যখন আমার সাত-আট বছর বয়স, স্কুলে পড়ার সময় পাড়ার পূজো মণ্ডপে বন্ধুদের নিয়ে একটি নাটক প্রযোজনা করেছিলাম। নাটকটির নাম মনে নেই। তবে রূপকথার আদলে রাজা, মন্ত্রী, সেনাপতি ইত্যাদি চরিত্রগুলি ছিল। আমারই লেখা, নির্দেশনাও আমার। বাড়ির বড়োরা, আত্মীয়স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশি সকলেই নাটকটি উপভোগ করেছিল। হয়ত আমাদের হাস্যকর উপস্থাপনার জন্যই। কয়েক বছর পর রবীন্দ্রনাথের 'মুকুট' মঞ্চস্থ করি। তার পর নাটকের সঙ্গে আর কোনও সংযোগ ছিল না। গল্পের বই পড়ার নেশা জাগে। কলকাতার ফকিরবাড়ি রাস্তায় থাকতাম। সেখানে কালিবাড়িতে বড়োদের নাটকের বিরামের সময় আমি এবং আমার বন্ধু সুব্রত দশ মিনিটের হাস্যকৌতুক করি। আমি ঘোড়ার ভূমিকায়, সুব্রত অন্ধ চরিত্রে। ছোটোবেলা থেকেই আমি খুব লাজুক ছিলাম। মঞ্চে অভিনয় করব ভাবতেই পারতাম না। দুলাল গুহ (যিনি পরবর্তীকালে অনেক হিন্দি চলচিত্র পরিচালনা করেছিলেন) নির্দেশক। তিনি হঠাৎ একদিন আমার লজ্জা ভাঙতে না পেরে চরিত্র বদল করে আমাকে অন্ধের পাঠ দিলেন। চোখ বন্ধ করে অভিনয় করতে হবে ভেবে পুলকিত হলাম। খুবই ভালো অভিনয়ও করলাম। যাকে বলে রিয়ালিস্টিক অভিনয়। আই ক্লোজডলি শাট মাই আইজ। টেবিলে রাখা জলের গ্লাস আমার হাত লেগে ভেঙে যায়। দর্শকরা এটাকে অ্যাকটিং ভেবে করতালি দিয়ে ওঠেন। তারপর সিরাজদৌল্লা নাটকে গোলাম হুসেনের পাঠ

করছিলাম। লজ্জার ভাব চোখে মুখে ফুটে উঠেছিল। অধিকাংশ সময় চোখ নিচু করে অভিনয় করেছিলাম। ফলে আমার ডাক নাম হয়ে গিয়াছিল লাজুক গোলাম হুসেন। এই আমার অভিনয় করা, নির্দেশনা, নাটক লেখার হাতেখড়ি। আর কোনোদিন মঞ্চে উঠিনি। অভিনয় করিনি। ... নাটক লেখা পুরোদমে শুরু করি, তখনই সিদ্ধান্ত নিই কোনও নাটক পরিচালনা করব না, কোনও দলের সক্রিয় সদস্য হব না। ... প্রাণের টানে লেখা বা অভিনয় কিছুই শুরু করিনি। মূলত সখে এবং দুলালদার চাপেই নাটক লেখা বা অভিনয় করা।"[৭]

১৯৬১ সালের (আষাঢ় ১৩৬৮) মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের লিখিত দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'গোলাপের বিরুদ্ধে যুদ্ধ' প্রকাশ করেন কৃত্তিবাসের পক্ষে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। গ্রন্থটি উৎসর্গ করেন মাতৃদেবী রেণুকা চট্টোপাধ্যায়কে। তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ 'অংকন শিক্ষা' প্রকাশ করেন দেবকুমার বসু। এই গ্রন্থের প্রকাশকাল ছাপা ছিল না। প্রকাশকাল সম্ভবত ১৯৬০-৬১। এরপর ১৯৬৩ সালের জানুয়ারি মাসে 'বহুরূপী' নাট্য পত্রিকায় 'মূল্যায়ন প্রসঙ্গে' শিরোনামে মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের একটি নিবন্ধ প্রকাশ পায়। অসীমকুমার বসু সম্পাদিত 'নাট্যভাবনা' নাট্যপত্রে 'অ্যাবসার্ড' নাটক শিরোনামে মোহিত চট্টোপাধ্যায় প্রথম নিবন্ধ প্রকাশিত হয় 'মূল্যায়ন প্রসঙ্গে' নিবন্ধটি দ্বিতীয় নিবন্ধ। ১৯৬৩ সালের অক্টোবর মাসে 'গন্ধর্ব' পত্রিকার শারদ সংখ্যায় (দ্বিতীয়) মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের প্রথম নাটক 'কণ্ঠনালীতে সূর্য' প্রকাশিত হয়। এক্ষেত্রে নাটককার মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের সমকালীন রূপরেখা ছিল নিম্নরূপ।

নাটককার মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের সমসাময়িক সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট তুলে ধরার ক্ষেত্রে একটু পূর্ব থেকে শুরু করা গেল, অর্থাৎ ১৯০৫ সালের লর্ড কার্জনের জাতির ভিত্তিতে বঙ্গভঙ্গের পরিকল্পনা ব্যর্থ হওয়া এবং ১৯১১ সালের বঙ্গভঙ্গ রদ আইন পাশের মধ্য দিয়ে। ১৯১২ সালে ব্রিটিশ সরকার ভারতের রাজধানী

কলকাতা থেকে দিল্লিতে স্থানান্তরিত করে। ১৯১৪-১৯১৮ পর্যন্ত প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূচনা ও সমাপ্তি। সালের বিশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে এ দেশে জাতীয়তাবাদী ও বিপ্লবী আন্দোলনের পাশাপাশি সাম্যবাদী ভাবনায় সমাজতান্ত্রিক চেতনার উন্মেষ ঘটে। ১৯১৭ সালে রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার এর মূলে কাজ করেছিল। ১৯২০ সালের ১৭ অক্টোবর রাশিয়ার তাসখন্দ শহরে কয়েকজন ভারতীয় মিলে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা করে। এঁদের মধ্যে ছিলেন মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। সম্পাদক নির্বাচিত হন মোহাম্মদ রফিক। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রতিক্রিয়া এবং ব্রিটিশ শাসন ও শোষণের নগ্ন রূপ এদেশের সাম্যবাদী ভাবনাচিন্তাকে সংগঠিত হতে সাহায্য করে। ১৯২৫ সালের এই ভারতে কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত হয়। ১৯২০ সালের প্রথম প্রতিষ্ঠার পর ভারতে মুজাফফর আহমেদ, সিঙ্গারা ভেলু প্রমুখের উদ্যোগে কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৩০ সালে কমিউনিস্টদের তৃতীয় ইন্টারন্যাশনালেই ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি স্বীকৃতি লাভ করে। তার পরেই এদেশে সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস গঠিত হয়। ১৯৩১ সালে গঠিত হয় ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির জেলা কমিটি। ১৯৩৩ সালের ডিসেম্বর মাসে কলকাতায় অনুষ্ঠিত হয় সর্বভারতীয় সম্মেলন। ১৯৩৪ সালে দেশে কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনাল শাখা রূপে স্বীকৃতি পায়। এবং ১৯৩৪ সালের ডিসেম্বর মাসে ব্রিটিশ সরকার এদেশের কমিউনিস্ট পার্টিকে বেআইনিরূপে ঘোষণা করে। তারই সঙ্গে ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস অন ওয়ার্কস লীগকেও নিষিদ্ধ করে দেয়। এই সময় প্রতিষ্ঠিত হয় কৃষক সভা (১৯৩৪ সালে)। অবশ্য তার আগেই ঘটে যায় ১৯২৯ সালের মিরাট ষড়যন্ত্র মামলা। ১৯৩৯ সালে তৈরি হয় কলকাতা জেলা কমিটি।

অসহযোগ আন্দোলনের সময় শ্রমিক আন্দোলনগুলিও যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। ইন্ডাস্ট্রির আর্নেস্ট কমিটির প্রতিবেদন থেকে জানা যায় ১৯২০-২১ সালে ১৩৭টি শ্রমিক ধর্মঘট হয়েছিল। আসামের চা কুলিরা তাদের নিজস্ব এলাকা ত্যাগ করে ১৯২১ সালের মে মাসে কুমিল্লা জেলার চাঁদপুরে এসে হাজির হয়। ব্রিটিশ সৈন্যরা বহু চা-কুলিকে গুলিবিদ্ধ করে

হত্যা করে। এর প্রতিবাদে সমাজের বিভিন্ন স্তর থেকে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে আসে। তাদের প্রতি সমর্থন জানিয়ে ইস্ট বেঙ্গল রেলওয়ে ও স্টিমার কর্মীরা ধর্মঘট করে। ১৯২০ সালের নভেম্বরে ও ১৯২১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে কলকাতার ট্রাম শ্রমিকেরা ব্রিটিশ মালিকদের বিরুদ্ধে ধর্মঘট করে। ১৯২২ সালের ফেব্রুয়ারি- মার্চ মাসে ইন্ডিয়া রেলওয়ে শ্রমিকরাও ধর্মঘট করে।

শ্রমিকদের থেকেই দেশে বৈপ্লবিক আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। ১৯২৮ সালে পাঁচ লক্ষের বেশি মানুষ এই ধর্মঘটে সামিল হয়। পিকেটিং ও ধর্মঘট কমিটি গঠন এই দুই ধরনের কৌশল ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে। সংগঠিত শ্রমিক আন্দোলনের মধ্যে ট্রেড ইউনিয়ন ও ধর্মঘট কমিটিগুলোর নেতৃত্ব লাভের জন্য কমিউনিস্ট পার্টি এবং গণতন্ত্রীদের সঙ্গে জাতীয়তাবাদী সংস্কারপন্থীদের আন্দোলন ব্যাপক আকার লাভ করে। বাংলা নাটকে শ্রমিক আন্দোলনের ছবি আঁকতে এই গণসংগঠনের ভূমিকা যথেষ্ট। অসহযোগ আন্দোলনের পরেই উল্লেখযোগ্য গণঅভ্যুত্থান হল গান্ধীজীর আইন অমান্য আন্দোলন। ১৯৩০ সালের ৩০ জানুয়ারি 'ইয়ং ইন্ডিয়া' পত্রিকা গান্ধীজী ব্রিটিশ সরকারের কাছে ১১ দফা দাবি পেশ করেন এবং সেগুলি না মানা হলে আইন অমান্য আন্দোলনের পথে যাওয়ার কথা ঘোষণা করেন। লবণ সত্যাগ্রহের মাধ্যমে শুরু হওয়া আইন অমান্য আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হয় ১৯৩২- ৩৪ সাল পর্যন্ত। শুরু হয় সভা-সমিতি, শোভাযাত্রা, বিদেশি পণ্য ও কর বয়কট এবং রেল, ডাক ও সরকারি সম্পত্তির উপর আক্রমণ ও আইন অমান্য। দেশজুড়ে কংগ্রেসের নেতাদের গ্রেফতার করা হয়। কংগ্রেস পরিচালিত নানারকম সেবামূলক প্রতিষ্ঠান বেআইনি ঘোষিত হয়। নানাবিধ অত্যাচার চলে। কিন্তু কোন কিছুই এই আন্দোলনকে দমন করতে পারেনি। আইন অমান্যের ডাক আছে বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন' নাটকে।

১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দের ৩ সেপ্টেম্বর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়। সরকার ভারতকে 'যুদ্ধরত দেশ' হিসেবে ঘোষণা করে। ফলে ভারতীয় রাজনীতি ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করে। ইতিমধ্যে

হাজার ১৯৪৬ সালে জাপানে অক্ষ শক্তির পক্ষে যুদ্ধে যোগদান করে এবং ভারতের দিকে এগিয়ে আসতে থাকে। ব্রিটিশ রাজ অভ্যন্তরীণ গোলযোগে লণ্ডভণ্ড। গান্ধীজীর 'হরিজন' পত্রিকায় ব্রিটিশকে ভারত ত্যাগ করতে বলেন। কারণ ব্রিটেনের উপস্থিতি জাপানকে ভারত আক্রমণের আমন্ত্রণ জানায়।

১৯৪২ সালের ১৪ জুলাই কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি ভারত ছাড়ো আন্দোলনের প্রস্তাব গ্রহণ করে। ১৯৪২ এর ভারতছাড়ো আন্দোলন ও আগস্ট আন্দোলন, বাংলায় ১৩৫০ সালের দুর্ভিক্ষের ছবি আমরা বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন', তুলসী লাহিড়ীর 'দুঃখীর ইমন', 'ছেঁড়াতার', দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দীপশিখা' নাটকে প্রত্যক্ষ করা যায়।

১৯৪২ সালের আন্দোলন ১৯৪৬ সালে নৌবিদ্রোহ ভারত তথা বাংলার রাজনীতিতে যথেষ্ট প্রভাব ফেলে। নৌ-সেনাদের বিদ্রোহের কারণ ছিল নৌবাহিনী বর্ণবৈষম্য মূলক মনোভাব। নৌবাহিনীর শ্বেতাঙ্গ অফিসাররা ভারতীয় নৌ-সেনাদের প্রতি অভদ্র ও অশালীন আচরণ করে। কারণে অকারণে তাদের গালি গালাজ করে। তাদের বেতন ছিল খুবই কম। অথচ একই কাজে নিযুক্ত ইংরেজ কর্মচারীরা অনেক বেশি বেতন ও সুযোগ সুবিধা ভোগ করতেন। এই সমস্ত কারণে নৌ-সেনারা বিদ্রোহ করে। এবং বিদ্রোহের সমর্থনে শ্রমিক শ্রেণি সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। উৎপল দত্তের 'কল্লোল' নাটকে নৌ-বিদ্রোহের কথা রয়েছে। কল্লোল নাটক বিষয়বস্তু আঙ্গিক বিচার উভয় দিক থেকেই এক অসামান্য সৃষ্টি। নৌবিদ্রোহের সমসাময়িককালে বাংলা কৃষকেরা তেভাগা (১৯৪৬-৪৯) আন্দোলন শুরু করে। সারা বছর উদয়াস্ত পরিশ্রম করেও অনাহার ও দারিদ্র্য, ব্যাধি ও অশিক্ষা ছিল তাদের নিত্যসঙ্গী। ১৯৪৬ অক্টোবর মাসে বাংলার দারিদ্র্য পীড়িত কৃষকেরা জমিদারদের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে যা তেভাগা আন্দোলন নামে পরিচিত। বিজন ভট্টাচার্যের 'দেবীগর্জন' নাটকে জোতদারদের শোষণের নগ্ন রূপ প্রকটিত হয়েছে। চাষিরা জমিদারদের বেআইনি সুদ না দেওয়ার প্রতিবাদ জানায়। পাঁচের দশকেই স্বাধীন ভারতের পথ চলা শুরু। টালমাটাল বিশ্ব পরিস্থিতি,

দেশভাগের ক্ষত সমাজে নিয়ে আসে আর এক সমস্যাদীর্ণ পরিস্থিতি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের করাল ছায়া থামলেও, মানুষের হিংসা, স্বার্থপরতা, লোভ, লালসা বিন্দুমাত্র অপসৃত হয় না। ভারতের সংবিধানে সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনের ইঙ্গিত ছিল। মানুষ ভেবেছিল গণতন্ত্র, নাগরিক অধিকার ধর্মনিরপেক্ষতা, বিজ্ঞানসম্মত ও আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গি সুনির্দিষ্ট আর্থিক পরিকল্পনা সমাজতন্ত্রের প্রথম সোপানে মাত্র। স্বপ্ন ভাঙতে বেশি দেরি হয়নি কারণ দারিদ্র্য, বেকারত্বের পাশাপাশি ছিল ৪৬ এর দাঙ্গার ক্লান্ত ভাঙ্গা মন। আর তারপরই স্বাধীন ভারতের উদ্বাস্তু সমস্যায় জর্জরিত হয় বাংলার জনজীবন।

১৯৫০ সালে সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত বাংলাতে চালের দাম বেড়ে যায়। জোরদার ও চোরাকারবারীরা নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র মজুত করায় পরিস্থিতি আরও জটিল হয়। ১৯৫২ সাল পর্যন্ত কংগ্রেস সরকার খাদ্য পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ চালায়। কিন্তু সরকারের নিয়ন্ত্রণ নীতি ব্যর্থ হয়। ১৯৫৪ সালের জমিতে ভালো ফসল হলেও বিধিবদ্ধ রেশনিং, মূল্য নিয়ন্ত্রণ, লেভি ইত্যাদি উঠে গেলে রাজ্যে অবাধ বাণিজ্য নীতি শুরু হয়। ফলে অবাধ মজুতদারি মুনাফা লুঠ শুরু হয়। ১৯৫৬ সালে পুনরায় শুরু হয় খাদ্য সংকট ও দুর্ভিক্ষ। পরিস্থিতি অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে। সমসাময়িককালে বামপন্থী আন্দোলন কিছুটা মন্থর করে তৎকালীন কংগ্রেস সরকার হিংসাত্মক পদ্ধতিতে ক্ষমতা দখলের অভিযোগে কমিউনিস্ট পার্টিকে ১৯৪৮ সালের নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। ১৯৫০ সালে নিষেধাজ্ঞা উঠে গেলে বৃহত্তম সামাজিক স্বার্থে বামপন্থী সংগঠনগুলো আন্দোলন জোরদার করে।

১৯৫১ সালে কুচবিহারে খাদ্যের দাবিতে মানুষ ভুখা মিছিল করে। ১৯৫৪ সালে ট্রাক ভাড়া বৃদ্ধির প্রতিবাদে শ্রমিকেরা আন্দোলন করে, ১৯৫৪ সালেই শিক্ষকরা তাদের দাবি-দাওয়া পূরণের জন্য ধর্মঘটে সামিল হন। ১৯৫৫ সালে গোয়া মুক্তি আন্দোলনের সমর্থনে কলকাতায় স্বতঃস্ফূর্ত সভা মিছিল ও হরতাল পালিত হয়। ১৯৫৬ সালে সীমানা পুনর্বিন্যাসের

দাবি নিয়ে মিছিল শুরু হয়। ১৯৫৭ সালে চালকল শ্রমিক এবং বন্দরকর্মীরা আন্দোলনের পথে নামে। ১৯৫৮ সালে আবার উদ্বাস্তু আন্দোলন শুরু হয়।

১৯৫৯ সালের ৩১ আগস্ট খাদ্য আন্দোলন শুরু হয়। বাংলায় কংগ্রেস শাসনাধীন রাজ্যের মানুষ শুধু দু মুঠো খাদ্যের দাবিতে শহরের রাস্তায় মিছিল করে। তৎকালীন কংগ্রেস সরকার বর্বরোচিত উপায়ে ৮০ জন আন্দোলনকারীকে হত্যা করে। 'যুগান্তর' পত্রিকায় এ বিষয়ে লেখা হয়—

> "খাদ্যশস্যের মূল্যবৃদ্ধির ফলে পশ্চিমবঙ্গে যে শোচনীয় অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে তাহা অবর্ণনীয়। এই ব্যাপারে সরকারী নীতির ব্যর্থতা আরও গুরুত্বপূর্ণ। ফসল উঠিবার সঙ্গে সঙ্গে সরকার চাউলের যে মূল্য নির্ধারণ করিয়া দিয়াছিলেন সে মূল্য কোনো কালেই উহা পাওয়া যায় নাই, কিছুকাল পূর্বে এই ব্যর্থতা নিবারণকল্পে সরকার যে নীতি গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাতে বাজার হইতে চাউল একেবারে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছিল। নির্ধারিত মূল্য আরো বাড়িয়া গেল। এই অসহনীয় অবস্থার বিরুদ্ধে আন্দোলন তীব্র হইয়া উঠে তাহা নিশ্চয়ই অনিবার্য। ... অসহায়তা ও দীর্ঘকালের প্রতিকারহীনতা মানুষকে তীব্রতর করিয়া তোলে।"[৮]

রাজনীতির আঙ্গিনা ছেড়ে এই পালাবদলের আর্তি সাহিত্য-শিল্পকেও ছুঁয়ে গিয়েছিল। সাহিত্য সমাজের দর্পণ আর নাটক হল দৃশ্যবস্তু। তাই ১৯৫৯ সালে যে খাদ্য আন্দোলন হয়েছিল তার প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায় বিজন ভট্টাচার্যের 'দেবীগর্জন' নাটকে।

১৯৫৯ সালের খাদ্য আন্দোলন ১৯৬৬ সালের গোড়াতেই আবার শুরু হয়। ইতিমধ্যে ১৯৬৭ সালের মে মাসে উত্তরবঙ্গের নকশালবাড়িতে কৃষক পুলিশ জোতদার তীব্র সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। র‍্যাডিক্যাল ছাত্রদের একাংশ নকশালবাড়ির কৃষক বিদ্রোহের সমর্থনে জনমত

গঠনে প্রস্তুত হয়। ছাত্র আন্দোলনের মূল উপাদান মানবতা এবং গণতান্ত্রিক চেতনাকে ছাপিয়ে এই জোয়ার রাজনৈতিক চেহারা নিয়েছিল। ক্ষুধার্ত কর্মহীন যুবকেরা দেখে - চারপাশে অফুরন্ত ভোগ্যবস্তুর প্রদর্শনী, সমাজের একাংশ আনন্দ-স্ফূর্তিতে মাতোয়ারা। কিন্তু দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের তাতে কোনো অধিকার নেই। শ্রেণিশত্রুর রক্তে হাত রাঙিয়ে তাই আদর্শ কমিউনিস্ট হবার জন্য নকশালবাড়ি আন্দোলনের তাত্ত্বিক নেতা চারু মজুমদার ডাক দিলেন। সহকারি কানু সান্যাল এবং জঙ্গল সাঁওতাল। নকশালবাদীরা চেয়েছিলেন চীনের সাহায্যে ভারতের হিমালয় সংলগ্ন এলাকায় একটি মুক্ত অঞ্চল গড়ে তুলতে। কিন্তু হিংসাত্মক কার্যকলাপের জন্য যক্তফ্রন্ট সরকার তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হয়। বিগত বছরগুলোতে রাজনৈতিক বিতর্ক, তাত্ত্বিক আলোচনা ও প্রচারের মধ্য দিয়ে যে বৈপ্লবিক পরিমণ্ডল গড়ে তোলবার চেষ্টা চলেছিল তা এলোমেলো হয়ে যায়। শ্রেণিশত্রু আবিষ্কারের জন্য নানা ধরনের সবলীকৃত তত্ত্ব হাজির হয়। এমতাবস্থায় ঘরোয়া যুদ্ধের আকার ধারণ করে। এ প্রসঙ্গে বিপানচন্দ্র তাঁর 'India After Independence' গ্রন্থে লিখেছেন —

> " The CPI(ML) and other Naxalite groups argued that democracy in India was sham, the Indian state was Fascist, agrarian relations in India were still basically Feudal; the Indian big bourgeois watch comprador, India was politically and economically dominated by U.S., British and Soviet imperialisms, Indian policy and economy were still colonial, the Indian revolution was still in its anti imperialist, anti-feudal stage, and protected Guerrilla warfare on the Chinese model was form revolution would take in India.[৯]

কমিউনিস্ট আন্দোলন ও কমিউনিস্ট পার্টির যাবতীয় কার্যকলাপ পশ্চিম বাংলার বুদ্ধিজীবি মহল থেকে নিম্নবিত্ত মানুষ সকলকেই বিপুলভাবে আন্দোলিত করেছিল। ছয়ের দশকের মধ্যভাগে সেই পার্টির ভাঙ্গন ও দশকের শেষে দ্বিতীয় ভাঙ্গন মধ্যবিত্ত মানুষকে অভূতপূর্ব ভাবাবেগে আবিষ্ট করেছিল। বিশেষত ১৯৬৭ সাল থেকে নকশালবাড়িকে কেন্দ্র করে কৃষক বিদ্রোহ এবং তাতে বুদ্ধিজীবীদের বিপুল সমর্থন ও বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানে সাহায্য করা। ১৯৬৭ সালের ২১ নভেম্বর যুক্তফ্রন্ট সরকারিভাবে বাতিল হয়। বহু নেতা ও কর্মী বিক্ষুব্ধ হয়ে চলে যান নকশাল আন্দোলনে, উৎপল দত্তও আকৃষ্ট হয়েছিলেন এই মতাদর্শের দ্বারা। মিনার্ভা থিয়েটারে উৎপল দত্তের নেতৃত্বে গড়ে উঠেছিল নকশাল আন্দোলনের সাংস্কৃতিক ফন্ট সংযুক্ত গণ শিল্পী সংঘ। ১৯৬৭ সালের নভেম্বর মাসে শরিকদের মধ্যে গুরুতর মতভেদ এবং কলহের ফলে যুক্তফ্রন্ট ভেঙে যায় এবং ডক্টর প্রফুল্ল ঘোষ-এর নেতৃত্বে পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট দ্বিতীয়বার সরকার গঠন করে। কয়েকদিনের মধ্যে পুনরায় অন্তর্কলহের ফলে সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারানোর ফলে কোন সরকার গঠিত না হওয়ায় রাষ্ট্রপতি শাসন প্রবর্তিত হয়। ১৯৬৮ সালে বিধানসভার নতুন নির্বাচনের পরে একটি দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসে। এই সময় কলকাতা শহরের কয়েকটি অঞ্চলে নকশাল আন্দোলন পুরোদমে শুরু হয়। অন্যদিকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জ্যোতি বসু সিপিএম নেতা হিসেবে ঘোষণা করলেন যে এখন থেকে শ্রমিক ও মালিক পুলিশ মালিকদের পক্ষ নেবে না এবং শ্রমিকদের অধিকার থাকবে মালিক এবং ম্যানেজারদের ঘেরাও করা। এইভাবে শুরু হয় ঘেরাও আন্দোলন। এতে শিল্পজগতে অরাজকতার সৃষ্টি হয়। ১৯৭০ সালে পশ্চিমবাংলায় এই অরাজকতার জন্য অজয় মুখোপাধ্যায় নিজেও সিপিএমের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নামলেন। পরে পুনরায় বাংলা রাষ্ট্রপতি শাসন জারি হয়।

১৯৭১ সালের গোড়ার দিকে নতুন করে বিধানসভা নির্বাচনে অজয় মুখোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে ফিরে এলেন। এই সরকার বেশিদিন টিকল না। এই সময় পার্শ্ববর্তী পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক ঘটনাবলীর ক্রমশ সংকটের দিকে এগিয়ে যায়। তার প্রভাব

পশ্চিমবাংলায় পড়ে। ১৯৭১ সালে মার্চ মাসে নির্বাচনে যেতে তাকে ক্ষমতায় আসতে না দেওয়ায় এবং পাকিস্তান সরকার সামরিক বাহিনীকে পূর্ব বাংলার উপরে লেলিয়ে দেওয়ায় আওয়ামী লীগের নেতা শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন এবং স্বাধীন বাংলা ঘোষণা করলেন। ভারত সরকার স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছিলেন। পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর অত্যাচারে প্রায় ৯০ লক্ষ বাঙালি শরণার্থী পূর্ব বাংলা ছেড়ে পশ্চিম বাংলায় আশ্রয় নেয়। পুরো সীমান্ত জুড়ে সামরিক তৎপরতা শুরু হয়। দৃঢ়হস্তে এই সংকটের মোকাবিলা করার জন্য অজয় মুখোপাধ্যায় সরকার পদত্যাগ করেন এবং পুনরায় রাষ্ট্রপতি শাসন জারি হয়। ৬ ডিসেম্বর ভারত পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়। সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় সেনাবাহিনী বাংলাদেশের মুক্তি বাহিনীর সাহায্যে তিনদিক থেকে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। ভারতীয় বিমান বাহিনী ও স্থল বাহিনীর সাহায্যে এগিয়ে যাওয়া এবং কয়েক দিনের মধ্যে পূর্ব বাংলার স্থিত পাকিস্তান বিমান বাহিনী ধ্বংস করে দেয়। ভারতের সেনাবাহিনী ১৫ ডিসেম্বর ঢাকা দখল করে এবং ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশে পাকিস্তান প্রধান সেনাপতি জেনারেল নিয়াজি ভারতের সেনাবাহিনী ও মুক্তি ফৌজ মিলিত বাহিনীর সর্বাধিনায়ক জেনারেল জে এস অরোরার কাছে আত্মসমর্পণ করেন। স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার তখন থেকে গণতন্ত্র গণপ্রজাতন্ত্র স্বাধীন বাংলাদেশের সরকার রূপে আত্মপ্রকাশ করে।

১৯৭২ সালে পশ্চিমবাংলা বিধানসভা নির্বাচনে সিদ্ধার্থ শংকর রায়ের নেতৃত্বে কংগ্রেস বিপুল ভোটে জয়ী হয়। বিরোধী বামপক্ষ ব্যাপকহারে নির্বাচনে কারচুপির অভিযোগ করেন এবং প্রতিবাদে বিধানসভা বয়কট করেন। সিদ্ধার্থ শংকর রায় সরকার পাঁচ বছর ক্ষমতায় ছিলেন। বিরোধী পক্ষ বলতে শুধু কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য ছিল। এই সরকারের প্রধান কাজ ছিল অভূতপূর্ব কঠোরতার সঙ্গে নকশালবাদীদের দমন করা। অনেককে অনির্দিষ্টকালের জন্য কারাগারে বন্দি করে রাখা হয়। নকশালবাদী সন্ত্রাস ক্রমে ক্রমে অবসান হয় এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে শিল্পের পুনরুত্থানের কিছু কিছু লক্ষণ দেখা দেয়। কিন্তু কংগ্রেসের গভীর অন্তর্দ্বন্দ্বের

ফলে এই সরকার তেমন কোন উল্লেখযোগ্য সাফল্য দেখাতে পারেনি, গতানুগতিকভাবে সরকার চলেছিল।

১৯৭৫ সালে এলাহাবাদ হাইকোর্ট ইন্দিরা গান্ধীর নির্বাচন অবৈধ ঘোষণা করেন। গভীর অনিশ্চয়তার শুরু হয়। ডান ও বামপন্থী সব দলই ইন্দিরা গান্ধীর পদত্যাগের দাবিতে দেশব্যাপী আন্দোলন গড়ে তোলে। এই আন্দোলনের জোরালো হাওয়াতে ইন্দিরা গান্ধী ২৫ জুন দেশে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেন ও প্রায় সমস্ত বিরোধী নেতাকর্মী ও কিছু কিছু সাংবাদিকদের গ্রেফতার করেন। এই সব ঘটনার জন্য কংগ্রেসের প্রভাব দ্রুত গতিতে হ্রাস পেতে থাকে।

১৯৭৭ সালে ইন্দিরা গান্ধী মনে করলেন যে তিনি যে ব্যবস্থা নিয়েছেন তার প্রতি জনগণের সমর্থন দরকার। ১১ জানুয়ারি তিনি নতুন নির্বাচন ঘোষণা করলেন এবং তার কয়েক দিন পর জরুরি অবস্থার অবসান ঘোষণা করেন। ১৯৭৭ সালে মার্চ মাসের নির্বাচনে কংগ্রেস উত্তর ভারতের সমস্ত রাজ্যে পরাজিত হয় নবগঠিত জনতা পার্টির কাছে। এই জনতা পার্টি ছিল ডানপন্থী ও বামপন্থী সব দলকে নিয়ে গড়া। পশ্চিম বাংলায় কংগ্রেস প্রায় সবগুলো আসনে পরাজিত হয়। বিপুল ভোটে জয়ী হয় বামপন্থীরা এবং জ্যোতি বসুর নেতৃত্বে প্রথম বামফ্রন্ট সরকার গঠিত হয়। ২০০১ সাল পর্যন্ত জ্যোতি বসুর নেতৃত্বে এইসব সরকার বহাল থাকে। এই সালেই তার বার্ধক্য হেতু পদত্যাগের জন্য তাঁর স্থলাভিসিক্ত হন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। ২০০১ সালের নির্বাচনে বামফ্রন্ট সরকার পুনরায় জয়লাভ করে। ২০০৬ সালের নির্বাচনে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে বামফ্রন্ট সরকার বিপুল ভোটাধিক্যে ক্ষমতা ধরে রাখে। এই নিয়ে বামফ্রন্ট সরকার পশ্চিমবঙ্গে পরপর সাতবার সাধারণ নির্বাচনে জয়ী হয়। এটি পৃথিবীর ইতিহাসে এক অভূতপূর্ব ঘটনা। বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে বামফ্রন্ট সরকার চেষ্টা করে কিছুটা চীনা আদর্শে শিল্পায়ন এবং অবাধ অর্থনীতির পথে চলতে। কিন্তু বাধা আসে রক্ষণশীল মার্কসবাদের প্রবক্তা এবং সেই মতে চলা শ্রমিক সংগঠনগুলি থেকে। ২০১১

সালের বিধানসভা নির্বাচনে দীর্ঘ ৩৪ বছর সরকার গঠনকারী বামফ্রন্টের ভরাডুবি হয়। কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে আসা তৃণমূল কংগ্রেস মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীনে নতুন সরকার গঠন করে। বলা বাহুল্য যে যেদিন নির্বাচনের ফলাফল ঘোষিত হয় সেই দিন অর্থাৎ ২০১১ এর ১৩ই মে প্রখ্যাত নাট্যকার বাদল সরকার পরলোক গমন করেন।

লক্ষণীয় মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের আবির্ভাবের বেশকিছু পূর্ব কাল থেকেই ভারতসহ বিশ্ব ইতিহাসের সর্বাঙ্গীণ ক্ষেত্রে তথা রাজনৈতিক-সামাজিক-অর্থনৈতিক এমনকি ভাব জগতেও চরম অস্থিরতা সৃষ্টি হয়। যার প্রভাব এই সময়ের সাহিত্যকেও অত্যন্ত জোরালো ভাবে প্রভাবিত করে। মোহিত চট্টোপাধ্যায় কাব্য থেকে নাটকের জগতে প্রবেশ করেন। আর তাঁর নাটক এর মধ্যেও দেখা যায় 'এক সৎ এবং সারস্বত দায়িত্ববোধের প্রকাশ' (মোহিত চট্টোপাধ্যায় নাটক সমগ্র, ভূমিকা- কুমার রায়)। মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের রচনায় সমসাময়িক পরিবেশ পরিস্থিতি কিভাবে প্রভাব ফেলেছিল আলোচনার বিষয় সমালোচকের কথাতেই বলা যেতে পারে —

> "আমরা মোহিতের নাটক নিয়ে আলোচনা করছি - এবং সত্য বিশ্বাস নিয়ে বলতে পারি যে এই নাটকের এই সংলাপের মধ্যে, কিংবা এই চরিত্রের মধ্যে এই নাটকের মধ্যে আমরা ব্যক্তি মোহিতকে চিনে নিতে পারি - আর এই চিনতে পারার মধ্যেই আমাদের ভালো লাগার আনন্দলাভ। এই কথাগুলো বলা হয়ে গেলে আবারো ভাবনায় আসে ওই সংলাপ, ওই চরিত্র এবং ওই নাট্য-ক্রিয়ায়, - একটু অনুধাবন করলে কি আমরা ধরে ফেলবো কোনও পূর্বসৃষ্টির ছায়াপাত - যা একটা বিশেষ সময়ের সাক্ষী - ব্যক্তিগত নয়। যা অন্য কোনও স্রষ্টার অভিজ্ঞতাতেও এসেছে এ দেশে কিম্বা ভিনদেশে। অতিবাহিত সময়টাকে একটু দেখা যাক। মোহিতের অনুভবের নির্মাণ কাঠামো কি গড়ে উঠেছিল সেই সময়ের

স্বদেশ এবং আন্তর্জাতিক সাহিত্য আবহাওয়ায়। - সময়কে আমরা সাধারণত বিচার করতে পারি বাস্তবজীবন দিয়ে, সামাজিক প্রতিষ্ঠান দিয়ে এবং বিশেষ আদর্শ দিয়ে। "[১০]

মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের নাটকে তাঁর জীবন ও সমকালের প্রতিফলন কিভাবে পড়েছিল তা বিশ্লেষণের যাওয়ার আগে নাট্যকারের সমগ্র রচনা পরিচয় সংক্ষেপে আলোচনা করা গেল।

মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের প্রথম নাটক 'কণ্ঠনালীতে সূর্য'। প্রথম প্রকাশ ১৯৬৩ গন্ধর্ব নাট্য পত্রিকার শারদ সংখ্যায়। ১৯৬৪ সালে ক্লিমেন্স ডেনের রচনা 'উইল শেকসপিয়র: একটি কল্পনা' অনবদ্য কাব্যনাট্য রচনা করেন মোহিত চট্টোপাধ্যায়। এই সালে তাঁর 'জ্যোৎস্নায় নিদ্রিত ফুল' নামে প্রথম উপন্যাস প্রকাশিত হয়। ১৯৬৪ সালের অক্টোবর মাসে বিদেশি গল্পের ভাবানুবাদ 'নীলরঙের ঘোড়া' নাটকটি গন্ধর্ব নাট্যপত্রের শারদ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। নক্ষত্র নাট্যদলের প্রকাশনায় গ্রন্থাগারে 'মৃত্যুসংবাদ' নাটকটি মুদ্রিত হয়। প্রথম অভিনয় হয় ১৯৬৫ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর। ১৯৬৫ সালে 'চৈত্রের উড়ন্ত ফুল' নামে দ্বিতীয় উপন্যাস প্রকাশিত হয়। ১৩৭২ বঙ্গাব্দের আষাঢ় মাসে প্রকাশিত হয় কবিতার বই 'শবাধারে জ্যোৎস্না'। ১৯৬৫ সালের অক্টোবর মাসে 'বাইরের দরজা' নাটকটি প্রকাশিত হয়েছে। এই বছরেই বীক্ষণ প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত হয় দুটি নাটক 'নীলকণ্ঠের বিষ' এবং Franza Kafkar-র অনুসৃজন নাটক 'মেটামরফোসিস'। 'ক্ষপণক' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় 'রিং' নামে একাঙ্ক নাটক। ১৯৬৬ সালে তিনি জঙ্গিপুর কলেজ থেকে কলকাতার সিটি কলেজ বর্তমানে আনন্দমোহন কলেজে অধ্যাপনার কাজে যোগ দেন। এই কলেজ থেকেই তিনি কর্মজীবনে অবসর গ্রহণ করেন ১৯৯৪ সালে। ১৯৬৬ সালের ২০ এপ্রিল অভিনয় হয় 'নীলরঙের ঘোড়া' নাটকটি। ১২ সেপ্টেম্বর অভিনয় হয় 'সোনার চাবি' নাটক। ১৯৬৬ সালে শারদ সংখ্যায় প্রকাশিত হয় 'গন্ধরাজের হাততালি' নাটকটি। 'গন্ধর্ব' নাট্য পত্রিকায় প্রকাশিত হয় 'মৃত্যু সংবাদ' নাটকের দ্বিতীয় পর্ব জিরাদ্যু লিখিত 'দ্য এনচ্যাটেন্ড' নাটকের অনুসৃজন

'চন্দ্রলোকে অগ্নিকাণ্ড'। ১৯৬৭ সালের ২৬ জুলাই 'মুক্তাঙ্গন' রঙ্গমঞ্চে প্রথম অভিনয় হয় 'চন্দ্রলোকে অগ্নিকাণ্ড' নাটকটি। শ্যামল ঘোষের নির্দেশনায় নক্ষত্র গোষ্ঠী প্রযোজনায়। ভালোবাসার বিরুদ্ধে সমাজে প্রাচীন শক্তি ও অন্ধ কুশাসনের বিনাশমূলক ষড়যন্ত্র এই নাটকের বিষয়বস্তু। এই নাটকের প্রেমিক চরিত্রের সংলাপে 'রক্তকরবী' রাজাকে মনে পড়ে যায়। এ প্রসঙ্গে অশোক মুখোপাধ্যায়ের মন্তব্য উল্লেখ্য —

> "নাটক যেখানে কবিতা হয়ে উঠতে চায় এবং কবিতা যেখানে চায় নাটকের অবয়ব সেই নাতি স্পষ্ট ধূসর সীমানায় দাঁড়িয়ে থাকা মোহিতের নাটক এই প্রথম প্রয়োজন প্রযোজনায় উচ্চারণের ভঙ্গি খুঁজে পেল। শ্যামল ঘোষের যেটা শক্তির জায়গা অভিনেতা এবং প্রযোজক হিসেবে সেটা মোহিতের নাটক পেল সুখপ্রদ অবলম্বন।"[১১]

১৯৬৭ সালে প্রকাশিত হয় 'বিমলেন্দুর জীবন' নামক তৃতীয় উপন্যাসটি। সমকালে তিনি 'বৃত্ত' নামে উপন্যাস রচনা করেন যার প্রকাশকাল অজ্ঞাত। নানা রঙের ফিতা দিয়ে কাঠের ফ্রেমে কাল্পনিক এক ড্রয়িংরুম। অনুভবের টানাপোড়েন। সম্পর্কের খেলা, টুকরো টুকরো করে জীবনকে খেলনা বানানো। খেলতে খেলতে এক একটা পরিচয় খুঁজতে হন্যে হয়ে ওঠে তৃতীয় বিশ্বের মানুষ। ভেঙে যায় মানুষ, মানুষের সমাজ, সংসার, রাষ্ট্র। ব্যক্তির আইডেন্টিটি নিয়ে দেখা দেয় বিরাট প্রশ্ন চিহ্ন। এই সকল বিষয় নিয়ে রচিত 'গন্ধরাজের হাততালি' নাটকটি। ১৯৬৭ সালের ৬ আগস্ট মনোজ মিত্রের নির্দেশনায় 'রঙমহলে' প্রথম অভিনীত হয় নাটকটি। ১৯৬৭ সালের রূপকধর্মী নাটক 'সিংহাসনের ক্ষয়রোগ' প্রকাশিত হয়। এ এক কল্পকাহিনির নাটক, *"কিন্তু সে কাহিনী বাস্তব থেকে দূরে নিয়ে গিয়েও বড় প্রত্যক্ষ হয়ে দেখা দেয়। আমাদের অভিজ্ঞতারই অংশ হয়ে ওঠে। ... এ নাটক পড়তে পড়তে মনে হয় রক্তকরবী পর্বের রবীন্দ্রনাথ মোহিতের কলমের ডগায় ভর করেছেন- কবি মোহিতের এ জাতীয় নাটকে বোধ হয় সেটাই প্রত্যাশিত।"*[১২]

১৯৬৭ সালের জুলাই-আগস্ট মাসে 'অভিনয় দর্পণ' পত্রিকার প্রথম বর্ষের তৃতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত হয় 'পুষ্পক রথ' নাটকটি। স্বপ্ন কিংবা দুঃস্বপ্নের নাটক হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন নাটককার মোহিত তাঁর 'দ্বীপের রাজা' নাটকটিকে। পশ্চিমী অ্যাবসার্ড নাটকের মৌলিক লক্ষণ- অস্তিত্বের অর্থহীনতা। কিন্তু এ নাটকে মোহিত চট্টোপাধ্যায়কে আলোড়িত করেছে সেই সময়ে ঘটে যাওয়া সারা বিশ্বের নানা ঘটনা। তার মধ্যে অন্যতম ঘটনা ঘৃণ্য হাইড্রোজেন বোমার সফল পরীক্ষা। এই ঘটনা নিয়ে বেশ প্রচারধর্মী জ্বালাময়ী প্রতিবাদ হতে পারত। কিন্তু তিনি পথে হাঁটেননি। কবির মনোজগতের স্বপ্ন আর দুঃস্বপ্নের মধ্যে একটা সেতু আবিষ্কার করেছেন নাটককার তাঁর এই নাটকে। আন্তর্জাতিক প্রেক্ষিতে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলি যেন এক বিবর্তনের স্তর। এ নাটক যখন প্রথম ছাপা হয় 'থিয়েটার' পত্রিকা ১৯৬৮ সালে বাংলা ১৩৭৫ বঙ্গাব্দে। মোহিত চট্টোপাধ্যায় নাটকটির মুখবন্ধে লিখেছিলেন —

> "নাটকটির চরিত্র ও বর্ণ অনেকটা কোন দুঃস্বপ্নে বদলে যাওয়ার মতো, একটি সবুজ গাছের ক্রমশ ভৌতিক নিষ্পত্র শূন্যতায় রূপান্তরের মতো- আজকের যুদ্ধের মুখোমুখি পৃথিবীর যা পরিণাম।"[১৩]

বস্তুত, 'দ্বীপের রাজা' নাটকটি তৈরি হয়েছিল আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত একটি খবরকে কেন্দ্র করে। খবরে ছিল- আমেরিকার একটি দ্বীপে মার্কিন সরকারের একটি যুদ্ধ বিমান যান্ত্রিক গোলযোগের জন্য অবতরণ করতে বাধ্য হয়। সেই মার্কিন যুদ্ধবিমানে মজুত ছিল হাইড্রোজেন বোমা। যান্ত্রিক বিভ্রাট দূর করে বিমানটি আকাশে উড়ে যায়। কিন্তু একটি বোমা তরমুজের খেতে থেকে যায়। স্বপ্নসম এই ঘটনাটিকে নাটকের বিষয় হিসেবে বেছে নিলেন মোহিত চট্টোপাধ্যায়। সেই মহা বিপজ্জনক বোমায় পদাঘাত করে এক বালক। প্রবল ঘৃণা ও খেলার ছলে বোমাটা লাথি মেরে পৃথিবীর প্রথম মানুষ 'পেপে'। সর্বনাশা মারণ অস্ত্রে লাথি মারার স্পর্ধা দেখিয়ে সেই হয়ে ওঠে 'দ্বীপের রাজা'। এই আখ্যানবস্তুকে কেন্দ্র করে মোহিত চট্টোপাধ্যায় তাঁর নাটকে কল্পনা আর বাস্তবের সংযোগসূত্র গড়ে তোলেন। যা

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ছুঁয়ে থাকা বাস্তবকে অতিক্রম করে বৃহত্তর তাৎপর্যকে বহন করে। এই নাটক প্রসঙ্গে নাট্যসমালোচক সৌমিত্র বসুর মন্তব্য এখানে উল্লেখ্য-

> "১৩৭৫ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত 'দ্বীপের রাজা' থেকেই মোহিত তাঁর অসম্ভবের সঙ্গে সমকালীন রাজনীতিকে খুব স্পষ্ট ও সার্থকভাবে মেলাতে পারলেন।"[১৪]

১৯৬৯ সালের ৮ মে 'মৃত্যুসংবাদ' নাটকটি নক্ষত্র প্রকাশনী থেকে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়' আইরিশ নাট্যকার J. M. Synge (1871-1909)-এর 'The Play Boy of the Western World'(1907) নাটকের কাহিনি অণুষঙ্গে 'মৃত্যুসংবাদ' নাটকটি রচনা করেন মোহিত চট্টোপাধ্যায়। ১৯৬৯ সালের মার্চ-এপ্রিল মাসে 'অভিনয় দর্পণ' পত্রিকায় দ্বিতীয় বর্ষের দ্বিতীয় সংখ্যায় 'বাজপাখি' নাটকটি প্রকাশিত হয়। একই বছরে 'নিষাদ' নাটকের হিন্দি অনুবাদ 'আদাকাব' নির্দেশনা ও প্রযোজনা করেন কিষেণকুমার। ১৯৭১ সালের ঝড়ো হাওয়ার পরিবেশকে বিশ্লেষণের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন তাঁর 'বাঘবন্দী' নাটকে। সত্তর দশক,স্বর্গ এবং পৃথিবী - তিন দৃশ্যের এই নাটক 'অভিনয় দর্পণ' পত্রিকায় অক্টোবর ১৯৭০ সালে প্রকাশিত হয়। ১৯৭০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে 'অভিনয়' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় 'ক্যাপ্টেন হুররা' নাটকটি ।

১৯৭০ সাল পর্যন্ত মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের নাটক রচনা এক ধারায় চলছিল। ১৯৭১ সালের গোড়াতেই তাঁর রচনায় একটা বিবর্তন দেখা যায়। তাঁর সৃজনশীলতাও পরিবর্তিত হয়। যার মধ্যে মানুষের অন্তর্লোকের জগৎও আছে আবার প্রত্যক্ষ বাস্তব জগতের সমস্যাও আছে। আশির দশকের গোড়াতেই নকশাল আন্দোলনের রক্তাক্ত রাজনৈতিক পরিবেশ। এই প্রেক্ষাপটে তিনি রচনা করলেন 'গিনিপিগ' পরে 'রাজরক্ত' নাটক নামে পরিচিত। সিঁথির পাতিপুকুরে থাকাকালীন এই নাটকটি লিখেছিলেন তিনি। মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের সর্বাধিক মঞ্চ সফল নাটক এটি। প্রদর্শনী সংখ্যা ২১৯। 'রাজরক্ত' নাটকের নামকরণ করেন অশোক

মুখোপাধ্যায়। 'রাজরক্ত' নাটকে বিক্ষুব্ধ বিদ্রোহী যুবসম্প্রদায়ের কণ্ঠস্বর শোনা যায়। 'গিনিপিগ' নাটকটি 'বহুরূপী' নাট্যপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল। নাটকের নাট্যদর্শনে নাটককার বলতে চেয়েছিলেন ক্ষমতার হাতে মানুষ গিনিপিগ মাত্র। বিভাস চক্রবর্তী নির্দেশনায় তিনি দেখালেন গিনিপিগরাও একদিন ঘুরে দাঁড়ায়। প্রতিশোধ নিতে চায়। তারা চায় রাজরক্ত। এ প্রসঙ্গে বিভাস চক্রবর্তীর বক্তব্য ছিল-

> "আমাদের যে রাষ্ট্র ব্যবস্থা রয়েছে তার সবটাই সাজানো। যেখানকার জিনিস সেখানে রয়েছে, সেটা সেখানে সাজানো থাকবে। নিয়ম ভাঙা যাবে না। ... আমরা মুক্ত নই, আমরা একটা কারাগারের মধ্যে আছি। রক্তকরবী রাজা যেভাবে থাকতেন, জালের আড়ালে। ওই লাল দরজাটার মধ্যে রাজার ঘর। আমাদের শাসনব্যবস্থা সাধারণ মানুষকে গিনিপিগের মতোই করে রেখেছে। তরুণ প্রাণ গুলি ... প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কথা বলছে, অস্ত্র ধরছে ... রাজরক্ত চাইছে, শ্রেণীশত্রুকে হত্যা করে করার দাবি করছে।"[১৫]

তাঁর লেখা 'রাজারক্ত' (গিনিপিগ) বাংলা রাজনৈতিক নাটকের ইতিহাসে মাইলফলক হিসাবে বিবেচিত হয়। কলকাতা ভিত্তিক থিয়েটার গ্রুপ থিয়েটার ওয়ার্কশপ বিভাস চক্রবর্তী পরিচালনায় প্রথম কলকাতায় এই নাটকটি পরিচালনা করেছিলেন। পরে বিভিন্ন ভাষায় নাটকটির অনুবাদ হয়। দিল্লির রাজিন্দর নাথ হিন্দি অনুবাদ করে অভিনয় করেন। বিখ্যাত অভিনেতা কুলভুশন খারব্যান্ড এই নাটকে অভিনয় করেছিলেন। মুম্বাইয়ে সত্যদেব দুবে এই নাটকে পরিচালনা করেন এবং বিখ্যাত চলচ্চিত্র অভিনেতা অমরেশ পুরী এই নাটকে অভিনয় করেন। আমল পালেকার মরাঠী অনুবাদ ও অভিনয় করেছেন এবং শ্যামানন্দ জালান এই নাটকের আরেকটি হিন্দি অনুবাদ রচনা করেছেন। রাজনৈতিক কারণেই ভারত সরকার দ্বারা নাটকটি নিষিদ্ধ হয়েছিল এই স্বাধীন ভারতে।

একজন দক্ষ নাটককার হিসেবে তিনি প্রায় শতাধিক নাটক লিখেছেন। তাঁর কিছু নাটক বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছে এবং নিয়মিত ভারতে বিভিন্ন থিয়েটার গোষ্ঠী দ্বারা মঞ্চস্থ হয়েছে। পূর্ণ দৈর্ঘ্যের নাটক ছাড়াও, সম্পাদনা এবং অনুবাদ করেছেন অনেক নাটক। তাঁর সৃষ্ট নাটকের একটি তালিকা নিম্নে দেওয়া হল:

নাটকের নাম	প্রথম প্রকাশ	প্রকাশ কাল	প্রথম অভিনয় কাল	প্রযোজক নাট্যদল
কণ্ঠনালীতে সূর্য	গন্ধর্ব নাট্যপত্র শারদীয় সংখ্যা	১৯৬৩	২১ মার্চ, ১৯৬৬	আনন্দম, শ্যামবাজার স্কোয়ার
নীলরঙের ঘোড়া	গন্ধর্ব নাট্যপত্র শারদীয় সংখ্যা	১৯৬৪	২০ এপ্রিল, ১৯৬৬	চতুর্মুখ নাট্যদল, কলকাতা
উইল শেকসপিয়ার (বাংলা অনুবাদ) (কাব্যনাট্য)	অভিনয় পত্রিকা	১৯৬৪(অনুবাদ) ১৯৭১(প্রকাশিত)	এপ্রিল, ১৯৭২	ক্যালকাটা পিপলস আর্ট থিয়েটার
মৃত্যুসংবাদ	নক্ষত্র প্রকাশন কর্তৃক গ্রন্থাকারে মুদ্রিত	ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৫	২৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৫	নক্ষত্র নাট্যগোষ্ঠী, কলকাতা
মেটামরফসিস (ফ্রানজা কাফকার রচনার অনুসৃজন)	বীক্ষণ প্রকাশনী	১৯৬৫		কোথাও অভিনীত হয়নি
বাইরের দরজা (ছোট নাটক)	গন্ধর্ব নাট্যপত্র (আগস্ট-অক্টোবর)	১৯৬৫	২৭জানুয়ারি, ১৯৬৬	রূপদক্ষ নাট্যগোষ্ঠী

গন্ধরাজের হাততালি	গন্ধর্ব নাট্যপত্র, শারদীয়	১৯৬৫	১৯৬৬	ঋতায়ন নাট্যদল, কলকাতা
রিঙ (ছোট নাটক)	ক্ষপণক পত্রিকা	১৯৬৫		অভিনয়ের কোনো খবর পাওয়া যায় না
সোনার চাবি	অভিনয় পত্রিকা (মুদ্রিত প্রকাশ)	১৯৬৬ ১৯৭৩(মুদ্রিত প্রকাশ)	১২ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৬	নক্ষত্র নাট্যগোষ্ঠী, কলকাতা
চন্দ্রলোকে অগ্নিকাণ্ড	বহুরূপী পত্রিকা, সংখ্যা -২৫	আগস্ট, ১৯৬৬	২৬ জুলাই, ১৯৬৭	নক্ষত্র নাট্যগোষ্ঠী, কলকাতা
সিংহাসনের ক্ষয়রোগ	অজ্ঞাত	১৯৬৭	২৫ ডিসেম্বর, ১৯৬৭	অনুকার নাট্যদল, কলকাতা
দ্বীপের রাজা	থিয়েটার পত্রিকা, শারদীয় সংখ্যা	অক্টোবর, ১৯৬৮	৩১ জানুয়ারি, ১৯৬৯	লোকায়ন নাট্যদল
বৃত্ত (ছোট নাটক) (অনুবাদ)	অজ্ঞাত	১৯৬৮	৮ নভেম্বর, ১৯৬৮	নান্দীকার, কলকাতা
পুষ্পক রথ	অভিনয় দর্পণ, বর্ষ- ১, সংখ্যা -২	জুলাই – আগস্ট, ১৯৬৮	১৯৭০	শৈল্পিক নাট্যদল
নিষাদ	অভিনয় দর্পণ, শারদীয় সংখ্যা, বর্ষ -১, সংখ্যা-৩	আগস্ট- সেপ্টম্বর, ১৯৬৮	১৯৬৯ (হিন্দিতে)	আদাকার নাট্যসংস্থা
বাজপাখি (ছোট নাটক)	অভিনয় দর্পণ, বর্ষ- ২, সংখ্যা -৬	মার্চ-এপ্রিল, ১৯৬৯	২ জুলাই, ১৯৭০	লোকায়ন গোষ্ঠী

বাঘবন্দী	অভিনয় দর্পণ, শারদীয় সংখ্যা	অক্টোবর, ১৯৬৯	১৯৭১	ক্যালকাটা পিপলস আর্ট থিয়েটার
ক্যাপ্টেন হুররা	অভিনয় নাট্যপত্রিকা,	সেপ্টেম্বর, ১৯৭০	৪ ডিসেম্বর, ১৯৭০	নক্ষত্র গোষ্ঠী, কলকাতা
গিনিপিগ, পরিবর্তিত নতুন নাম রাজরক্ত (অশোক মুখোপাধ্যায়ের দেওয়া)	বহুরূপী নাট্যপত্র, সংখ্যা-৩ (বিশেষ নাট্য সংখ্যা)	সেপ্টেম্বর, ১৯৭০ (গ্রন্থাকারে প্রকাশিত ১৯৭৪)	২৫ জানুয়ারি, ১৯৭১	থিয়েটার ওয়ার্কস
তোতাকাহিনি (নাট্যরূপ) (ছোট নাটক)	বিশেষ তথ্য পাওয়া যায়নি	১৯৭০		
ফিনিক্স (ছোট নাটক)	শুধু থিয়েটার নাট্য পত্রিকা	১৯৭৩(লিখিত) ১৯৮৪(মুদ্রিত প্রকাশ)		
আলিবাবা (পুনর্লিখন) (মূল নাটক- ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ)	শূদ্রক নাট্যপত্র,সংখ্যা -৪	১৯৭৩	২৩ নভেম্বর, ১৯৮৮	থিয়েটার ওয়ার্কসপ
স্বদেশী নক্সা (প্রেমেন্দ্র মিত্রের লেখা ‘রাম ও শ্যাম’ গল্পের নাট্যরূপ)	গ্রুপ থিয়েটার পত্রিকা, বর্ষ -৭, সংখ্যা - ২	১৯৭৪(লিখিত) ১৯৮৫(মুদ্রিত প্রকাশ)	২৩ নভেম্বর, ১৯৭৪	থিয়েটার কমিউন নাট্যদল
মৃচ্ছকটিক (পুনর্লিখন) (শূদ্রকের লেখা সংস্কৃত নাটকের প্রথম অনুবাদ করেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৭৪ সালে)	সমীক্ষণ প্রকাশিত ‘মোহিত চট্টোপাধ্যায় নাট্য সংকলন’	১৯৭৫(রচনাকাল) ১৯৯০(মুদ্রিত প্রকাশ)	২৬ ডিসেম্বর, ১৯৯০	সমীক্ষণ নাট্যদল

মহাকালীর বাচ্চা	থিয়েটার বুলেটিন নাট্যপত্রিকা	অক্টোবর ১৯৭৭	১১ জুলাই, ১৯৭৮	থিয়েটার ওয়ার্কস নাট্যদল
লাঠি (ছোট নাটক)	থিয়েটার বুলেটিন নাট্যপত্রিকা	১৯৭৯	১৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৮০	রঙ্গবাণী থিয়েটার ইউনিট
মাছি (ছোট নাটক)	থিয়েটার বুলেটিন নাট্যপত্রিকা	১৯৭৮	১৯৭৮	বেতার মঞ্চে প্রযোজিত হয়
গালিলেওর জীবন(অনুবাদ), (ব্রের্টোল্ড ব্রেখটের নাটক)	থিয়েটার বুলেটিন নাট্যপত্রিকা	১৯৮০ (অনুবাদ কাল, মুদ্রিত প্রকাশ-১৯৮১, প্যাপিরাস প্রকাশনী থেকে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত-১৯৮২	১৮ নভেম্বর, ১৯৮০	কলকাতা নাট্যকেন্দ্র
কানামাছি খেলা	সমীক্ষণ প্রকাশিত ‘মোহিত চট্টোপাধ্যায় নাট্য সংকলন’	১৯৮৩(রচনাকাল) ১৯৯০(মুদ্রিত প্রকাশ)	১৯ ডিসেম্বর, ১৯৮৩	সমীক্ষণ নাট্যদল, কলকাতা
বর্ণ বিপর্যয় (ছোট নাটক)	অজ্ঞাত	১৯৮৩	১৯৮৩	বৃত্তের বাইরে, কলকাতা
ভূত (ছোট নাটক)	গ্রুপ থিয়েটার পত্রিকা, বর্ষ -৬, সংখ্যা -২	জানুয়ারি ১৯৮৪	২৬ জানুয়ারি, ১৯৯৬	নান্দীমুখ
নোনাজল (ছোট নাটক)	মহানগর শারদীয় পত্রিকা, সম্পাদনা – সমরেশ বসু	১৯৮৪ – রচনাকাল, ১৯৯২-মুদ্রিত প্রকাশ	১৯৮৪	গণকৃষ্টি নাট্যসংস্থা

তৃতীয় নয়ন (ছোট নাটক)	অজ্ঞাত	১৯৮৪	১৯৮৪	থিয়েটার কমিউন নাট্যদল
যশোমতী (নাট্যরূপ), (রাজশেখর বসুর গল্প অবলম্বনে)	অজ্ঞাত	১৯৮৪	১৯৮৪	থিয়েটার কমিউন নাট্যদল
ঋগ্বৈদিক (কাব্যনাট্য)	গন্ধর্ব নাট্যপত্র	১৯৮৫	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
জেনেসিস (চিত্রনাট্য), (সমরেশ বসুর 'উতারিয়া' গল্প অবলম্বনে মৃণাল সেনের সঙ্গে যৌথ প্রয়াস)		১৯৮৬		
তোতারাম	সমীক্ষণ প্রকাশিত 'মোহিত চট্টোপাধ্যায় নাট্য সংকলন'	১৯৮৬ – রচনাকাল, ১৯৯০- মুদ্রিত প্রকাশ	১৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৬	সমীক্ষণ নাট্যদল, কলকাতা
সোক্রাতেস	নাট্য আকাদেমি পত্রিকা - ২	১৯৮৯- রচনাকাল, জানুয়ারি ১৯৯৩- মুদ্রিত প্রকাশ	২৪ অক্টোবর, ১৯৮৯	নক্ষত্র নাট্যদল, কলকাতা
নাক (ছোট নাটক)(নাক ও কল্পমন দুটি একাঙ্ক এক সঙ্গে অভিনয় হয়)	অজ্ঞাত	১৯৮৯	৩১ জুলাই, ১৯৮৯	সংস্তব নাট্যসংস্থা, কলকাতা
মল্লভূমি (ছোট নাটক)	আজকাল, শারদীয় সংখ্যা	১৯৮৯-রচনাকাল, ১৪১৪ বঙ্গাব্দ- মুদ্রিত প্রকাশ	এপ্রিল ১৯৮৯	সংস্তব নাট্যসংস্থা , কলকাতা
বমন (ছোট নাটক)	অজ্ঞাত	১৯৯১	১০ অক্টোবর, ১৯৯১	শৈল্পিক সংস্থা, হাওড়া

সুন্দর (ছোট নাটক)	দেশ পত্রিকা	১৯৯১ – রচনাকাল, ১৮ নভেম্বর ১৯৯৮- মুদ্রিত প্রকাশ	২ ডিসেম্বর, ১৯৯১	সংস্তব নাট্যসংস্থা, কলকাতা
তখন বিকেল (অনুসৃজন)(মূল নাটক রাশিয়ান নাট্যকার Alexey Arbuzov এর Old World)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১৭ এপ্রিল, ১৯৯২	গান্ধার নাট্যদল
লোভেন্দ্র গবেন্দ্র (পুনর্লিখন)(মূল নাটক রাজকৃষ্ণ রায় লিখিত)		১৯৯২	৩০ সেপ্টেম্বর, ১৯৯২	সমীক্ষণ নাট্যদল, কলকাতা
জোছনাকুমারী(সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'জোছনাকুমারী' উপন্যাসের নাট্যরূপ)		১৯৯২	১৪ নভেম্বর, ১৯৯২	অন্য থিয়েটার, কলকাতা
শমীবৃক্ষ (ছোট নাটক)		১৯৯২	১৯৯২	প্লেমেকার্স নাট্যদল, কলকাতা
ঢিসুম ঢিসুম- পরে নামকরণ করেন মুষ্ঠিযোগ (ছোট নাটক)	গন্ধর্ব নাট্যপত্রিকা	১৯৯২ – ঢিসুম ঢিসুম নামে লিখিত, ১৯৯৩- মুষ্ঠিযোগ নামে প্রকাশিত	২২ এপ্রিল, ১৯৯৩	সংস্তব নাট্যসংস্থা, কলকাতা
গুহাচিত্র (ছোট নাটক)	স্যাস নাট্যপত্রিকা, সংখ্যা-১০	১৯৯৩	১১ নভেম্বর, ১৯৯৪	সমীক্ষণ নাট্যদল, কলকাতা

গজানন চরিত মানস	রঙ্গপট নাট্যপত্র, দশম সংখ্যা	১৯৯৪- রচনাকাল, ২০১৩- পুনর্মুদ্রণ	১৭ অক্টোবর, ১৯৯৪	প্লেমেকার্স নাট্যদল, কলকাতা
জন্মদিন(William Gibson এর 'The Miracle Worker' নাটকের অনুসৃজন)	গ্রুপ থিয়েটার নাট্যপত্রিকা	১৯৯৭- রচনাকাল ১৯৯৯- মুদ্রিত প্রকাশ	১৯ আগস্ট, ১৯৯৭	চুপকথা নাট্যদল, কলকাতা
কাল বা পরশু (Max Frisch এর 'The Raiser' নাটকের ইংরেজি অনুবাদের বাংলা অনুসৃজন)	স্যাস নাট্যপত্রিকা, সংখ্যা -১৪	১৯৯৭	২৩ ডিসেম্বর, ১৯৯৭	নাট্যাঙ্গন সংস্থা, ফারাক্কা
অক্টোপাস লিমিটেড (ছোট নাটক)	স্যাস নাট্যপত্রিকা, সংখ্যা -১৫	১৯৯৭	২০০০	প্লেমেকার্স, কলকাতা
বিপন্ন বিস্ময় (ছোট নাটক)	আজকাল, শারদ সংখ্যা	১৯৯৮	১৯৯৮	প্লেমেকার্স, কলকাতা
সিদ্ধিদাতা (ছোট নাটক)	স্যাস নাট্যপত্রিকা, সংখ্যা -১৬	১৯৯৯	জানুয়ারি, ২০০২	সমকালীন শিল্পীদল, কলকাতা
হারুণ-অল রশিদ (ছোট নাটক)	প্রতিদিন পত্রিকা শারদ সংখ্যা	অক্টোবর, ১৯৯৯	১৭ এপ্রিল, ২০০৩	মাঙ্গলিক সংস্থা, কলকাতা
দর্পণ (ছোট নাটক)	তথ্যকেন্দ্র পত্রিকা	১৯৯৯	১৯৯৯	নাট্যাঙ্গন নাট্যদল, ফারাক্কা, মুর্শিদাবাদ

তুষাগ্নি (Slawomir Mrozekএর 'The Police' নাটকের বাংলা অনুসৃজন) (ছোট নাটক)	স্যাস নাট্যপত্রিকা, সংখ্যা -১৭	২০০০	২২ মে, ২০০০	সংস্তব নাট্যসংস্থা, কলকাতা
জাম্বো (ছোট নাটক)	নাট্যপত্র ঘরে বাইরে	জুলাই ২০০১	২৭ মার্চ, ২০০৪	কথাকৃতি নাট্যদল
মিস্টার রাইট (ছোট নাটক)	স্যাস নাট্যপত্রিকা, সংখ্যা-১৮	২০০১	২৭ সেপ্টম্বর, ২০০৩	নান্দীমুখ নাট্যদল
কালের যাত্রা (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাটকের সম্পাদনা)		২০০৩	২৭ মার্চ, ২০০৩	সমীক্ষণ নাট্যদল, কলকাতা
জুতো (ছোট নাটক)	স্যাস নাট্যপত্রিকা, শারদীয়, সংখ্যা-২০	২০০৩	১৫ নভেম্বর, ২০০৩	সোহন নাট্যদল
কারাদণ্ড (ছোট নাটক)	বিভাব সাহিত্যপত্র, শারদ সংখ্যা	অক্টোবর ২০০৩	২০০৩	সমীক্ষণ নাট্যদলের প্রতিষ্ঠা দিবসে পাঠ অভিনয় করেন জগন্নাথ বসু ও উর্মিমালা বসু
ঘুম (ছোট নাটক)	বহুরূপী নাট্যপত্র,(শারদীয়) সংখ্যা-১০০	অক্টোবর ২০০৩	৬ জানুয়ারি, ২০০৭	সংস্তব নাট্যদল 'এই ঘুম' নামে সল্টলেকের বি.ডি. হলে

				প্রযোজনা করে।
বাণভট্ট	রঙ্গপট নাট্যপত্র, নবম সংখ্যা	২০০৩ রচনাকাল, ২০১২ – মুদ্রিত প্রকাশ		রঙ্গপট নাট্যদল মঞ্চায়নের দায় ও অধিকার বহন করে।
মানময়ী গার্লস স্কুল(রবীন্দ্র মৈত্র লিখিত মূল নাটকের সম্পাদনা)		২০০৪	২৩ মে, ২০০৪	সমীক্ষণ নাট্যদল, কলকাতা
মিসেস সোরিয়ানো (এডুয়ার্ড ডি ফিলিপো রচিত নাটকের বাংলা অনুবাদ করেন অরুণ মুখোপাধ্যায়, পুনর্লিখন ও সম্পাদনা করেন নাটককার মোহিত চট্টোপাধ্যায়)		২০০৪	২৪ মে, ২০০৪	চুপকথা, বেহালা
তুষের আগুন (তুষাগ্নি নাটকের পরিবর্তিত নাম)	রঙ্গপট নাট্যপত্র, প্রথম সংখ্যা	২০০৪		সংস্তব নাট্যসংস্থা, কলকাতা
শেষ রক্ষা (রবীন্দ্র নাটকের সম্পাদনা)		২০০৪	২০০৪	রঙরূপ নাট্যসংস্থা
কালোব্যাগ (প্রথম অনুনাটক)	থিয়েটারঙ্গ নাট্যপত্র	২০০৪		অজ্ঞাত
ভেনিসের বণিক (শেকসপিয়রের ‘Marchent of Venice’ নাটকের অনুবাদ)	অনুষ্টুপ, সংখ্যা-৩৮	২০০৪	২০১১	চুপকথা, কলকাতা

ভালোমন্দ (ছোট নাটক)		২০০৫	৩০ মার্চ, ২০০৫	অন্য থিয়েটার নাট্যদল
দাহ (ছোট নাটক)	স্যাস নাট্যপত্র, সংখ্যা- ২২	সেপ্টম্বর ২০০৫	২০০৯	শোহন নাট্যদল, কলকাতা
পুনর্জন্ম (দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের লেখা নাটকের পুনর্লিখন ও সম্পাদনা)		২০০৫	২০০৫	সমীক্ষণ নাট্যদল, কলকাতা
লাইসিসট্রাটা (অসম্পূর্ণ) (গ্রিক নাট্যকার Aristophanes লিখিত Lysistrata নাটকের বাংলা অনুসৃজন)				
মেঘ (উৎপল দত্তের লেখা নাটকের সম্পাদনা) (ছোট নাটক)		২০০৫		শোহন নাট্যদল, কলকাতা
গণশত্রু (ইবসেনের An Enemy of The Peopl নাটক অনুসরণে ও সত্যজিৎ রায়ের চিত্রনাট্য অবলম্বনে লিখিত)	রঙ্গপট নাট্যপত্র, নবম সংখ্যা	২০০৫- রচনাকাল ২০১২ – মুদ্রিত প্রকাশ	২০০৫	চেতনা নাট্যদল
একটি মাথা দুটি ছাতা (অণুনাটক)	নান্দীকার নাট্যমেলা স্মারকপত্র	ডিসেম্বর, ২০০৫		অজ্ঞাত

উড়োমেঘ (Georrge Fedeam লিখিত 'Revenge' নাটকের বাংলা অনুসৃজন)	রঙ্গপট, তৃতীয় সংখ্যা	২০০৬	২০০৬	চুপকথা নাট্যদলের জন্য অনুমোদিত
ভাইরাস (অণুনাটক)	'দশ কথা' নাট্য সংকলনের অন্তর্ভুক্ত	২০০৬ রচনাকাল, ২০০৯ – মুদ্রিত প্রকাশ		
বঙ্কুবাবু এলেন (Alan Alexander Milne এর Mr. Pim Passes By নাটকের আদলে লিখিত)	'স্যাস' নাট্যপত্র, সংখ্যা-২৩	২০০৬- রচনাকাল,	২০০৮	মাঙ্গলিক নাট্যদল
মৌমাছি (অণুনাটক)	'রঙ্গপট' নাট্যপত্র, চতুর্থ সংখ্যা	মহালয়া , ২০০৭		
সমান্তরাল (ছোট নাটক)	'সময়' বাংলা সাহিত্যপত্র	অক্টোবর ২০০৭		
হীরামন (ছোট নাটক), (John Lazarus এর 'Chester' নাটক অবলম্বনে লিখিত)	'স্যাস' নাট্যপত্র, সংখ্যা -২৪, মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের নির্বাচিত নাটক সংগ্রহে প্রকাশিত	২০০৭- রচনাকাল ২০১০-নাটক সংগ্রহে প্রকাশিত		শোহন নাট্যসংস্থার জন্য অনুমোদিত
আওরঙ্গজেব (মূল নাটকটি ইন্দিরা পার্থসারথি লেখেন, ভাষান্তর করেন- সত্য ভাদুড়ি, পুনর্লিখন করেন – মোহিত চট্টোপাধ্যায়)	'রঙ্গপট' নাট্যপত্র	সেপ্টম্বর ২০০৮	২০০৮	রঙ্গপট নাট্যদল

সেলফোন (ছোট নাটক)	‘দশ কথা’ নাট্য সংকলনে প্রকাশিত	২০০৮-রচনাকাল, ২০০৯ নাট্যসংকলনে প্রকাশ	২০০৯	গিলোটিন, মাথাভাঙ্গা
কৌটো (ছোট নাটক)	‘দশ রূপক’ গ্রন্থে সংকলিত	জানুয়ারি, ২০০৯		
সরল অঙ্ক(ছোট নাটক)	‘দশ রূপক’ গ্রন্থে সংকলিত	জানুয়ারি, ২০০৯	২০০৯	অনুলাপ, চন্দননগর
বিধাতাপুরুষ (ছোট নাটক)	‘দশ রূপক’ গ্রন্থে সংকলিত	জানুয়ারি, ২০০৯		
ভূত (ছোট নাটক)	‘দশ রূপক’ গ্রন্থে সংকলিত	জানুয়ারি, ২০০৯		
ষোল পাতা (অণুনাটক)		২০০৯	১৮ ফেব্রুয়ারি, ২০০৯	কৃষ্টি সংসদ, সোনারপুর
উরুভঙ্গ (ছোট নাটক)	‘দশ কথা’ গ্রন্থে সংকলিত	আগস্ট, ২০০৯		
রাক্ষস (ছোট নাটক)	‘দশ কথা’ গ্রন্থে সংকলিত	আগস্ট, ২০০৯	২০১২	মান্দাস নাট্যদল, হাওড়া
আত্মকথা (অণুনাটক)	‘দশ কথা’ গ্রন্থে সংকলিত	আগস্ট, ২০০৯		
খরস্রোত (ছোট নাটক)	‘দশ কথা’ গ্রন্থে সংকলিত	আগস্ট, ২০০৯		
গ্রহণ (ছোট নাটক)	গ্রুপথিয়েটার পত্রিকা	অক্টোবর, ২০০৯		

ইন্টারভিউ (অণুনাটক)	ঋতবীণা, বর্ষ -৯ সংখ্যা -১	২০০৯- রচনাকাল, জানুয়ারি ২০১৩- মুদ্রিত প্রকাশ		
কাঁথা (অণুনাটক)	ঋতবীণা, বর্ষ -৯ সংখ্যা -১	২০০৯- রচনাকাল, জানুয়ারি ২০১৩- মুদ্রিত প্রকাশ		
যীশু (ছোট নাটক)	অসময়ের নাট্যভাবনা, বর্ষ-২১, সংখ্যা-২	২০০৯- রচনাকাল, ২০১৪-মুদ্রিত প্রকাশ		
ট্রিপল এক্স (ছোট নাটক)	মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের নির্বাচিত নাটক সংগ্রহে প্রকাশিত	জানুয়ারি, ২০১০		
ভূতনাথ (ছোট নাটক)		২০১০	২০১০	সংস্তব নাট্যদল, কলকাতা
মায়ের মতো (উৎস কবিতা –কবিতা সিংহ)		২০১০	২০১১	রূপরঙ, কলকাতা
ইচ্ছেপূরণ (মূল রচনা- রবীন্দ্রনাথের গল্প)	অসময়ের নাট্যভাবনা, বর্ষ-২১, সংখ্যা-২	২০১১ রচনাকাল, ২০১৪- মুদ্রিত প্রকাশ		
তথাগত	রঙ্গপট নাট্যপত্র, নবম সংখ্যা	২০১১ রচনাকাল, ২০১২- মুদ্রিত	৬মার্চ, ২০১২	রঙ্গপট, কলকাতা

মোহিত চট্টোপাধ্যায় তাঁর দীর্ঘ প্রায় পাঁচ দশকের শিল্পসাধনায় শতাধিক নাটক রচনা করছেন। তাঁর শেষ নাটক 'তথাগত' গৌতম বুদ্ধের জীবনী অবলম্বনে রচনা করেছেন। এ প্রসঙ্গে মোহিত চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'আমার নাটক লেখা' প্রবন্ধে বলেছেন-

> "ইদানিং কালে দেখবেন আমাদের নাট্যজগৎ থেকে জীবনীমূলক উধাও হয়ে গেছে- কিন্তু পুরোনো বহু নাটকে জীবনীমূলকতা পেতে পেতে আমি এখন যুদ্ধের জীবন নিয়ে 'তথাগত'- লেখবার চেষ্টা করছি। সেই পুরোনো ধারাটাতে এখানে নিয়ে এলাম- মানুষ কতটা পারে। মানুষ কতটা পোটেনশিয়াল তা দেখানোর জন্য। মানুষের জেগে ওঠার সবচেয়ে বড়ো দৃষ্টান্ত মানুষ। এই মানুষের কথা বলতে গিয়ে মানুষ কত শক্তিশালী হতে পারে সেটা মানুষকে জানবার জন্যই এই জীবনীমূলক নাটক লিখেছি। এটাকে একটা দায়িত্বপূর্ণ কাজ বলে আমি মনে করেছি।"[১৬]

তিনি শুধু কবি, উপন্যাসিক, প্রাবন্ধিক কিংবা নাটককার ছিলেন না, একই সঙ্গে তিনি বেশ কয়েকটি চিত্রনাট্যও রচনা করেছেন। ১৯৭৩ সালে মোহিত চট্টোপাধ্যায় মৃণাল সেনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতায় 'কোরাস' ছায়াছবির চলচ্চিত্র স্ক্রিপ্টে কাজ শুরু করেন। এই চিত্রনাট্যের কাহিনি রচনা করেছেন মোহিত চট্টোপাধায়, গোলাম কুদ্দুস ও মৃণাল সেন। ১৯৭৫ সালে 'কোরাস' মস্কো ও বার্লিন পুরস্কার লাভ করে। মৃণাল সেনের স্মৃতিচারণায় স্পষ্ট হয়ে ওঠে –

> "বাইবেলের Give us our daily bread- এর অনুকরণে খেতে না পেলে পাতা তো পাবে- এইরকম ভারি সুন্দর গান লিখেছেন মোহিত। ভাবনার সঙ্গে তাল মিলিয়ে খুব হাত চলে মোহিতের।"[১৭]

১৯৭৫ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি কবি, নাটককার, অধ্যাপক মোহিত চট্টোপাধ্যায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধায়ের বংশোদ্ভূত বিশিষ্ট অভিনেত্রী মমতা চট্টোপাধ্যায়ের বোন শুক্লা চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে। শুক্লাদেবী ইতিহাস বিষয়ে উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা ছিলেন। ১৯৮১ সালে তাঁদের একমাত্র পুত্র সায়ন (ডাকনাম - বাবুলি) চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম। ১৯৭৬ সালে মৃণাল সেনের মুক্তি পাওয়া ছবি 'মৃগয়া'র চিত্রনাট্য রচনা করেন মোহিত চট্টোপাধ্যায় উড়িয়া গল্পকার ভগবতীচরণ পানিগ্রাহীর গল্পের বাংলা অনুবাদ অবলম্বনে। গীত রচনাও তাঁর। গানে সুর দিয়েছিলেন সলিল চৌধুরি। মিঠুন চক্রবর্তী প্রধান চরিত্রের ভূমিকায় অসাধারণ অভিনয় করেন। ১৯৭৭ সালে প্রেমচন্দের 'কফন' গল্পের কাহিনি অনুসরনে মৃণাল সেনের 'ওকাউরি কথা' ছবির চিত্রনাট্য রচনা করেন মোহিত চট্টোপাধ্যায়। ১৯৮০ সালের ৫ ডিসেম্বর মুক্তি পাওয়া মৃণাল সেনের 'পরশুরাম' চলচ্চিত্রের চিত্রনাট্য ও গান মোহিত চট্টোপাধ্যায়েরই রচনা।

১৯৮০ সালে মোহিত চট্টোপাধ্যায় তাঁর প্রথম ও একমাত্র পরিচালিত প্রচেষ্টা, মেঘের খেলা (দ্য ক্লাউড অফ দ্য ক্লাউডস), একটি শিশু চলচ্চিত্র শেষ করেন। তিনি গল্প এবং চিত্রনাট্য লিখেছেন। পরে রাজা সেন চিত্রনাট্যটি পরিচালনা করেন। সহকারী পরিচালক ছিলেন; রণজিৎ রায়। সিনেম্যাটোগ্রাফার ছিলেন; দেবশিস দাশগুপ্ত। সঙ্গীত পরিচালক এবং সম্পাদনার দায়িত্বে ছিলেন মৃন্ময় চক্রবর্তী। পরবর্তী বছরগুলিতে মোহিত চট্টোপাধ্যায় টিভি সিরিয়াল (টিভি সিরিজ)-এর স্ক্রিপ্ট রচনা শুরু করেন। সুবর্ণলতা, অরোগ্যনিকেতন, আদর্শ হিন্দু হোটেল কলকাতা দূরদর্শন অঞ্চলের সবচেয়ে জনপ্রিয় এবং সমালোচকদের প্রশংসিত টেলিভিশন সিরিয়ালগুলির মধ্যে অন্যতম। মোহিত চট্টোপাধ্যায়ও থিয়েটার, চলচ্চিত্র উৎপাদন, এবং স্ক্রিপ্ট, নিবন্ধ লিখেছেন। তিনি বিভিন্ন সেমিনার, আলোচনা, কর্মশালা এবং সাহিত্য ও পারফর্মিং আর্টস সম্পর্কিত আলোচনায় অংশ নেন।

১৯৯১ সালে মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের পিতৃদেব নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রায় ৮৪ বছর বয়সে বার্ধক্যজনিত কারণে পরলোক গমন করেন। এই ঘটনার প্রায় নয় বছর আগে ১৯৮২ সালে মাতৃদেবী রেণুকা চট্টোপাধ্যায় ইহলোক ত্যাগ করেন। তিনি তাঁর শৈশব স্মৃতিচারণায় বলেছেন-

> "তাঁর মা-ই ছিলেন তাঁর কাছে সব। যতকিছু আদর, আব্দার মায়ের কাছেই ছিল। বাবা ছিলেন অত্যন্ত রাশভারী কড়া ধাঁচের। সেজন্য বাবার সঙ্গে দূরত্ব বজায় রাখতেন। কিন্তু হলে কি হবে একদিন স্কুলে স্বদেশী আন্দোলনের আঁচে জড়িয়ে পড়ে আটকে পড়েছিলেন। সারা স্কুল দখল নিয়েছে পুলিস। বিকেলে যখন ছাড়া পেলেন তখন দেখলেন রাশভারী গম্ভীর সেই বাবা স্কুলের গেটে উৎকণ্ঠিতভাবে অপেক্ষা করছেন - বেরিয়ে আসতেই বাবা তাঁকে কোলে তুলে নিয়েছিলেন, সবার অলক্ষে বাবার চোখে জল দেখেছিলেন। গভীর শ্রদ্ধায় তাঁর মাথাটা সেদিন নত হয়েছিল।"[১৮]

১৯৯১ সালে সঙ্গীত নাটক আকাদেমি পুরস্কার লাভ করেন মোহিত চট্টোপাধায়। সঙ্গীত নাটক আকাদেমি পুরস্কার পাওয়ার পর বারুইপুর মিশন সংঘের পক্ষ থেকে তাঁর জন্য সম্বর্ধনা সভার আয়োজন করে। তিনি বারুইপুর লাভার্স অ্যাসোসিয়েশন আয়জিত প্রথম বারুইপুর বই মেলার উদ্বোধক ছিলেন। ১৯৯৮ সালে পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি 'দীনবন্ধু' পুরস্কারে ভূষিত হন। অন্যান্য পুরস্কারের মধ্যে তিনি গিরিশ পুরস্কার, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুরস্কার, বি এফ জে এ পুরস্কার, নান্দীকার পুরস্কার পেয়েছেন। ২০০৫ থেকে ২০০৭ সাল পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি কর্মপরিষদের সদস্য ছিলেন তিনি। ২০০৬ সালের ২৩ নভেম্বরে পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি আয়োজিত ষষ্ঠ নাট্যমেলার উদ্বোধন করেন নাটককার মোহিত চট্টোপাধ্যায়। ২০০৭ সালে পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি আয়োজিত প্রযোজনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ শিবিরে প্রশিক্ষক নিযুক্ত হন তিনি। ২০০৮ সালের ৩ মার্চ সন্ধ্যায় বাংলা আকাদেমি সভাগৃহে স্বরচিত

নাটক পাঠ করেন নাটককার মোহিত। ২৭ মার্চ বিকেল ৩.৩০ মিনিটে বিশ্বনাট্য দিবস উপলক্ষে আয়োজিত পদযাত্রার উদ্বোধন করেন মোহিত চট্টোপাধ্যায়। ২০০৯ সালে ১৫ থেকে ১৯ জুলাই নাট্যশোধ সংস্থান ভবনে সম্পন্ন বাদল উৎসবের উদ্বোধন করেন নাটককার মোহিত। ২০০৯ সালের শেষ দিকে ভগ্নস্বর ও কণ্ঠনালীতে পীড়াজনিত কারণে অসুস্থ হয়ে পড়েন নাটককার। ডা. তপনজ্যোতি দাস ছিলেন প্রধান চিকিৎসক। ২০১০ সালের ১ সেপ্টেম্বর অসুস্থ নাটককারকে আর এস ভি হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। তাঁর স্বরনালীর পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয়। এখানে তিনি চারদিন ভর্তি ছিলেন। ৪ সেপ্টেম্বর প্রথম বায়োপ্সি রিপোর্টে নর্মাল রেজাল্ট ছিল। ওই বছর নাট্যকার চন্দন সেন ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হন। ২০১০ সালে সর্বসম্মতিক্রমে তিনি পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমির সভাপতি নির্বাচিত হন। ২৩ নভেম্বর দশম নাট্যমেলায় অসুস্থ অবস্থায় নাট্য আকাদেমির সভাপতি হিসেবে হাজরা পার্ক থেকে রবীন্দ্রসদন পর্যন্ত শোভাযাত্রার পুরোভাগে বিরামহীন ভাবে হেঁটে যান। তিনি তাঁর লিখিত অভিভাষণে বলেছিলেন-

> "এখন সুসময় নয় – অস্থির অশান্ত পরিবেশ। মানবিকতা আক্রান্ত, বিবেকবর্জিত হিংসা খড়্গহস্ত, অসভ্য দাম্ভিক গর্জনে উচ্চকণ্ঠ, অগ্রগতি প্রতিবন্ধকতায় বিচলিত। এ-সময় নাটকের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। নাটকের কাছে দুঃসময়ে মানুষ পাশে এসে দাঁড়ায়। নাটকের মধ্যে একটা দুর্জয় প্রাণশক্তি আছে- কয়েক হাজার বছর আগের জন্মকাল থেকে নানা প্রতিকূল অবস্থা ও বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত তা জিতবেই। সেখানে কোনো বাধাই বাধা নয়। নাটক সংকটকে বিশ্লেষণ করে এবং তার গ্রাস থকে উদ্ধারের সংকেত দেয়। নাটক মনে করিয়ে মানুষ কীভাবে মিলেমিশে বলবান হয়ে উঠতে পারে, নাটক শিখিয়ে দেয় বিষাদ সরিয়ে আমরা কীভাবে হেসে উঠতে পারি, নাটক ঘোষণা করে অন্যায় শেষ পর্যন্ত পরাজিত হতে বাধ্য।" [১৯]

২০১০ সালের শেষের দিকে গলায় অতিরিক্ত পীড়ার কারণে দ্বিতীয়বার বায়োপ্‌সি করা হয়। তাতে রেজাল্ট নর্মাল থাকে। ২০১১ সালে ২২ জানুয়ারি প্রবল শ্বাসকষ্টের কারণে দ্বিতীয়বার আর. ভি. এস. হাসপাতালে ভর্তি করা হয় তাঁকে। শ্বাসনালীতে ছিদ্র করে শ্বাস চলাচলের ব্যবস্থা করা হয়। এবং বায়োপ্‌সিতে শ্বাসনালীতে ক্যান্সার রোগ ধরা পড়ে। চিকিৎসা বিজ্ঞানের পরিভাষায় যাকে বলা হয় 'স্কোয়ামাস সেল কার্সিনোমা অফ ভোকাল কর্ড'। নাটককারকে সেদিনই ছেড়ে দেওয়া হয়। তিনি ভালোভাবে কথা না বলতে পারার কারণে শারীরিক এবং মানসিকভাবে অস্বস্তি বোধ করেন। ১১ ফেব্রুয়ারি তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের উদ্যোগে অসুস্থ নাটককার মোহিত চট্টোপাধ্যায়কে পি. জি. হাসপাতালের রেডিওথেরাপি বিভাগে ভর্তি করানো হয়। এই সময় তাঁকে ১৯ দিনে ৩৩ বার রেডিওথেরাপি দেওয়া হয়। হাসপাতাল থেকে নাটককারকে রানিকুঠির সরকারি আবাসনে নিয়ে আসা হয় ২৯ মার্চ। মে মাস থেকে পি জি হাসপাতালের ইএনটি বিভাগ ও রেডিওথেরাপি বিভাগে চিকিৎসা চলতে থাকে। অপরদিকে ২০১১ সালের বিধান সভার নির্বাচনে ৩৪ বছরের লালদুর্গের পতন ঘটে। নতুন মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন 'মা-মাটি-মানুষ' সরকারের অগ্নিকন্যা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বামফ্রন্টের এই শোচনীয় পরাজয়ে অসুস্থ নাটককার শারীরিক ও মানসিক ভাবে বিধ্বস্ত হয়ে পড়েন। বলাবহুল্য মনে প্রাণে তিনি মার্কসীয় ভাবধারায় বিশ্বাসী ছিলেন। সারা জীবন তিনি 'থিয়েটার - লেফ্‌টফ্রন্ট - ক্রিকেট' এই তিনটি জিনিসকে আঁকড়ে ছিলেন। পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমির সভাপতির পদ থেকে ইস্তফা দেন মোহিত চট্টোপাধ্যায়। ১৩ মে অ্যাবসার্ড থিয়েটার ও থার্ড থিয়েটারের পুরোধা কিংবদন্তী নাট্যকার বাদল সরকারের পরলোক গমন তীব্রভাবে শোকাহত করে তোলে নাটককার মোহিত চট্টোপাধ্যায়কে। বাংলা নাটকে তাঁরা দুজনেই ছিলেন সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমী মানুষ। বাংলা থিয়াটারে সুচিন্তক, পিতৃস্থানীয়। ভীষণ আঘাত সহ্য করেও মারণ রোগ ক্যান্সারের সঙ্গে তীব্র লড়াই চালিয়ে যান তিনি। অসুস্থ অবস্থায় একমাত্র পুত্র সায়ন চট্টোপাধ্যায়ের বিবাহ দেন ২০১২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে।

পুত্রবধূ সুস্মিতা পণ্ডিত (এক বেসরকারী কলেজে গণমাধ্যম বিভাগের অধ্যাপিকা। কলকাত আকাশবাণী বেতারকেন্দ্রের আংশিক সময়ের অনুষ্ঠান সঞ্চালিকা)। ৬ মার্চ বিড়লা সভাগৃহে মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের শেষ লেখা 'তথাগত' নাটকের অভিনয় দেখানোর বিশেষ ব্যবস্থা করা। গুরুতর অসুস্থ অবস্থায়ও তিন ঘন্টা পনের মিনিট নাটককার মন দিয়ে উপভোগ করেন। অভিনয় শেষে রঙ্গপট নাট্যসংস্থার পক্ষ থেকে তাঁর হাতে পুস্পস্তবক তুলে দেন প্রাক্তন মন্ত্রী ক্ষিতি গোস্বামী। অসুস্থ নাটককার হাত নেড়ে সবাইকে অভিবাদন জানান। এটাই ছিল নাটককারে জীবনে শেষ অভিবাদন। এর মাস খানেক পর ১৯ মার্চ প্রবল শ্বাসকষ্ট নিয়ে তৃতীয়বার আর. এস. ভি. হাসপাতালে ভর্তি হন। শ্বাস চলাচলের সুবিধার জন্য পুনরায় শ্বাসনালীতে একটি ছিদ্র (ট্র্যাকিওস্টোমি) করা হয়। জীবনের শেষ চব্বিশ দিন তাঁকে হাসপাতালে শয্যাশায়ী থাকতে হয়। কলকাতা পুরসভা তাঁর চিকিৎসার ব্যয়ভার বহন করে। ২০১২ সালের ১২ এপ্রিল সমস্ত রকম প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। 'কণ্ঠনালীতে সূর্য' নাটকের প্রণেতা নিজের কণ্ঠে কর্কট রোগকে ধারণ করে বাংলা নাট্য জগৎকে পিতৃহীন করে শেষ বিদায় জানান। তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন আর. এস. ভি. হাসপাতালে বিকেল ৪টা ৩৫ মিনিটে। ডাক্তারি মতে মৃত্যুর কারণ মাল্টিড্রাগ রেজিস্ট্যান্স নিউমোনিয়া ও সেফটিমিয়ার কারণে হার্ট লাঙ ফেইলিওর। তিনি শুধু সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন না, তিনি একই সঙ্গে কবি, নাট্যকার, ঔপন্যাসিক, প্রাবন্ধিক এবং সহৃদয় সংবেদী নাগরিক ও অভিভাবক ছিলেন। সাহিত্য ছিল তাঁর কাছে সমাজ বদলের হাতিয়ার স্বরূপ।

তথ্যসূত্র:

১। দাস, তপনজ্যোতি (সম্পাদক) : রঙ্গপট নাট্যপত্র, মোহিত চট্টোপাধ্যায় স্মরণ সংখ্যা, ২০১২, কলকাতা - ৯২, পৃষ্ঠা - ২৫।

২। রায়, শুভঙ্কর (অতিথি সম্পাদক) : প্রমা, মোহিত চট্টোপাধ্যায় বিশেষ সংখ্যা, ২০১৩, কলকাতা-৭৩, পৃষ্ঠা -১০৩।

৩। দে, ড. অপূর্ব : নাট্য-ব্যক্তিত্বের মুখোমুখি, দিয়া পাবলিকেশন, প্রথম প্রকাশ ২০১২, কলকাতা-০৯, পৃষ্ঠা - ২১ ।

৪। দাস, তপনজ্যোতি (সম্পাদক) : রঙ্গপট নাট্যপত্র, মোহিত চট্টোপাধ্যায় স্মরণ সংখ্যা, ২০১২, কলকাতা- ৯২, পৃষ্ঠা -২৩।

৫। তদেব-২৫

৬। রায়, শুভঙ্কর (অতিথি সম্পাদক) : প্রমা, মোহিত চট্টোপাধ্যায় বিশেষ সংখ্যা, ২০১৩, কলকাতা-৭৩, পৃষ্ঠা- ১২৭।

৭। দে, ড. অপূর্ব : নাট্য-ব্যক্তিত্বের মুখোমুখি, দিয়া পাবলিকেশন, প্রথম প্রকাশ ২০১২, কলকাতা-০৯, পৃষ্ঠা– ১৯–২০।

৮। পাল, ড. সঞ্জয় : বাংলা নাটকে গণআন্দোলন, ২০১৭, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা -৭০০০০৯, পৃষ্ঠা -৩০।

৯। তদেব, পৃষ্ঠা - ৩১।

১০। চট্টোপাধায়, মোহিত : নাটকসমগ্র, প্রথম খণ্ড, ভূমিকা অংশ- কুমার রায়, ২০০১, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা-৭০০০৭৩, পৃষ্ঠা —৮।

১১। দাস, তপনজ্যোতি (সম্পাদক) : রঙ্গপট নাট্যপত্র, মোহিত চট্টোপাধ্যায় স্মরণ সংখ্যা, ২০১২ কলকাতা-৯২, পৃষ্ঠা-২৯।

১২। চট্টোপাধায়, মোহিত : নাটকসমগ্র, প্রথম খণ্ড, ভূমিকা অংশ- কুমার রায়, ২০০১, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা-৭০০০৭৩, পৃষ্ঠা – ১৪।

১৩। তদেব– ১৩।

১৪। দত্তগুপ্ত, রঙ্গন (সম্পাদিত) : অসময়ের নাট্যভাবনা, জন্মদিনে ফিরে দেখা মোহিত চট্টোপাধ্যায়, এপ্রিল- জুন, ২০১৪, কলকাতা-৭০০০১৪, পৃষ্ঠা - ২১।

১৫। দাস, তপনজ্যোতি (সম্পাদক) : রঙ্গপট নাট্যপত্র, মোহিত চট্টোপাধ্যায় স্মরণ সংখ্যা, ২০১২, কলকাতা-৯২, পৃষ্ঠা - ৩১।

১৬। তদেব-৮৪।

১৭। তদেব-৩৩

১৮। রায়, শুভঙ্কর (অতিথি সম্পাদক) : প্রমা, মোহিত চট্টোপাধ্যায় বিশেষ সংখ্যা, ২০১৩, কলকাতা-৭৩, পৃষ্ঠা- ৮৩।

১৯। দাস, তপনজ্যোতি (সম্পাদক) : রঙ্গপট নাট্যপত্র, মোহিত চট্টোপাধ্যায় স্মরণ সংখ্যা, ২০১২, কলকাতা-৯২, পৃষ্ঠা-৬৭।

(বিঃদ্রঃ মোহিত চট্টোপাধায়ের জীবনী সংক্রান্ত অধিকাংশ তথ্য অনুষ্টুপ নাট্যপত্র, রঙ্গপট নাট্যপত্র এবং প্রমা নাট্যপত্রের অনুসরণে লিখিত।)